ইচ্ছের দিনকাল

হাসনান আহমেদ

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ– পরিচিতি

ড. হাসনান আহমেদের জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। তিনি একজন সুপরিচিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁর অ্যাকাউন্টিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে বৈচিত্র্যময় অবদান ও ভূমিকা দেশ-বিদেশের অ্যাকাডেমিশিয়ানস ও পেশাজীবী সমাজে স্বীকৃত। তিনি দেশ-বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ, প্রায় চার দশকের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাবিদ্যা এবং নানাবিধ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

তিনি একজন প্রাবন্ধিক, লেখক ও গল্পকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত স্কুল থেকে। তিনি সমসাময়িক বিক্ষুব্ধ সমাজব্যবস্থা ও বেপথুমান জীবনাচারের নিখুঁত ছবি অঙ্কনের একজন বলিষ্ঠ ভাষাশিল্পী। তাঁর লেখনীতে বর্তমান মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা, জনসমাজের দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, শিক্ষামানের অবনতি প্রভৃতির বাস্তব ও মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি তাঁর লেখনীতে মানবসম্পদ উন্নয়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনার ছবি একজন উদারচেতা শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে এঁকেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম ও নিখাদ উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের বইয়ে। তাঁর লেখনী সমকালীন সমাজ-সংগঠনের গতিপ্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনবৈচিত্র্য, পারিপার্শ্বিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার এক ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক বা আত্মমগ্ন উপাখ্যান।

(তৃতীয় কভারে বাকি অংশ)

এইসব দিনকাল

হাসনান আহমেদ

প্রকৃতি

এইসব দিনকাল

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশক
প্রকৃতি
১১৪-১৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: Prokriti.books@gmail.com

প্রচ্ছদ
হাসনান আহমেদ

অলংকরণ
মোঃ নাজমুল আলম (বুলবুল)

মুদ্রণ
লিংক ভিশন
মিরপুর, ঢাকা, linkvision.bd@gmail.com

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৪৪৪-০৪৩-২

মূল্য: ২৫০.০০ টাকা

Eisab Dinkal by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, September, 2022
Price: Tk. 250.00

উৎসর্গ

অতি আদরের নানুমণি ও দাদুমণি
মায়াবী, আরশান, রাবিবা–
তোমরা সবাই যখন অনেক বড় হবে,
আমি তখন আরো দূরে নিঃসীম আকাশে নেবো ঠাঁই।

লেখকের অন্যান্য বই:

জীবনক্ষুধা (কবিতা)
প্রতিদান চাইনি (উপন্যাস)
কিছু কথা কিছু গান (ছোটগল্প)
অপেক্ষা (উপন্যাস)
শেষবিকেলের পথরেখা (উপন্যাস)
সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম (প্রবন্ধ)
সত্যের গল্প গল্পের সত্য (ছোটগল্প)
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা (প্রবন্ধ)
নৈঃশব্দের কথকতা (উপন্যাস)
এসো শিক্ষা-সেবার ছায়াবীথিতলে (প্রবন্ধ)

আমার কথা

প্রতিদিন যা-কিছু দেখি, শুনি ও ভাবি তার কতটুকুই-বা কালির রেখায় ধরে রাখা যায়! এইসব দিনকালের কিছু কথা গল্প আকারে আমি শোনাতে চেষ্টা করেছি। এতে শিল্প-সাহিত্যের লেশমাত্রও নেই। পাঠক হয়তো মনের গভীরে গল্পগুলো ধরে রাখবেন, এই আশাতে।

লিখতে বসলেই শতেক কথা মাথার মধ্যে এসে ভিড় করে। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে বিবেচনা করে অনেক কিছুকেই পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। এতে অনেক প্রয়োজনীয় কথাই না-বলা রয়ে যায়। তবু কিছুটা হলেও যে ভাব প্রকাশ করতে পারছি, এতেই পড়ন্ত বিকেলের দিনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে। অতীতের লেখা আবার লিখতে ইচ্ছে করে:

অনেক কথা ছিল বলার
কেন জানি বলা হলো না–
আশার প্রস্ফুটিত ফুলগুলো শুকিয়ে শেষে ঝরে গেল,
বলা হলো না।
প্রত্যগ্র অনুভূতি দিনের শেষে উড়ে পালায়–
যেমনি পালায় রাতের স্বপন
দিনের বাস্তব-মুখর আলোর ঘনঘটায়,
যাত্রাপথে ট্রেনের কামরায় বসে ক্ষণিক সঙ্গী যেমন
স্টেশনে নেমে যার যার পথে পথ ধরা–
প্রতিদিন ঘটনার সাজে তেমনি ক্ষণিক দেখা,
অনুভূতির বেড়াজালে বেঁধে নেয়া
অসম্পূর্ণ বলা, যদিও বলার ছিল আরো।

ঢাকা, আগস্ট ২০২২

(হাসনান আহমেদ)

এইসব দিনকাল

সূচিপত্র

আয়নামতি ১৩
শিক্ষা আলাপন– অনলাইন ৩১
শান্তির আশ্রয় ও এক জালাল উদ্দিন ৪৯
৮১ কুমারী মায়ের স্বর্গযাত্রা
৯২ সার্ভিস এজেন্টশিপ
১১০ জীবন যেখানে যেমন: কোভিড-১৯

আয়নামতি

আমি একজন রিপোর্টার। কোনো কিছু রিপোর্ট করাই আমার কাজ। সমাজে যা ঘটে আমি নিজ চোখে দেখি, শুনি। পাশের গ্রামেই আমার বাস। নাম ভজানন্দ দেশি। আমি দেশি কথা বলি, দেশি কর্তা ভজন করে আনন্দ পাই, সুবিধাও পাই– এভাবে সমাজে টিকে থাকি। এটা আমার পেশা। সব জানা কথা বলতে পারিনে। মুখে ভাসুরের নাম বাধে, কর্তা অখুশি হন, রুজিতে টান পড়ে। তখন চুপ থাকি। মাঝে মাঝে আত্মপ্রবঞ্চনাও করি।

সেদিন এ গ্রামের এই পাড়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাতাসে ফুসফাস শব্দ কানে ভেসে এলো। ওদিকে কান খাড়া করলাম। আয়নামতিকে নিয়ে কথা। অনেকটাই বুঝলাম। বাকি তথ্য পরে সংগ্রহ করলাম। সমাজে আগের হাল আর নেই। নেই কোনো সামাজিক শাসন, আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ। কাউকে উটকো কোনো একটা ফাঁদে ফেলতে পারলেই পাতি নেতাদের কেল্লা ফতে– টাকা আদায়ের ফন্দি-ফিকির, কথায় কথায় দলবাজি, অস্ত্রের ব্যবহার। এ নিয়েই নিত্য বসবাস। রুজি-রোজগার এতে ভালো, ঝুঁকি কম। ক্ষমতার দাপট ও পেশিশক্তি দেখিয়ে সম্মান আদায়। এভাবেই দিন আসে দিন যায়।

এ পাড়ার আয়নামতিকে নিয়ে মহিলাঙ্গনে কানাকানি হচ্ছে। জোর গলায় কেউ কিছু বলছে না। এই না-বলাকে বলাই তো আমার কাজ। মহিলাদের কাছ থেকে স্বামীদের কানে, তারপর সমাজব্যাপী। সবাই জানে কিন্তু কোনো সালিস-দরবার, কেস-কাম্রা নেই। শুধুই কানাঘুষা। পুলিশেও জানানো নেই। কেস হয়েই-বা কী হবে, টাকার ভাগীদারের সংখ্যা বাড়ানো। কেস না হওয়া পর্যন্ত আমি রিপোর্ট করতেও পারিনে, আমার নামে মানহানি মামলার ভয়। এজন্য আমিও জেনে না-জানার ভান করে আছি। দেখি পানি গড়িয়ে কতদূর যায়। আমি ঘটনার পিছন পিছন হাঁটছি। কেস হলেই রিপোর্ট করবো।

আয়নামতির বাপ মারা গেছে কয়েক বছর আগে। যত চিন্তা এখন পিঠেপিঠি বড় ভাই আর মায়ের মাথায়। আয়নামতি ঘর থেকেই বের হয় না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটাই মেয়ে। আদর করে মা ও ভাই তাকে ডাকে আয়না বলে। আয়নামতি এখন সমাজের আয়না।

আয়নামতি আট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। সে-পড়া পড়া বলে না। বলা যায়, আট ক্লাস পর্যন্ত উঠেছে। বাপ মারা যাবার পর স্কুলে আর যাওয়া হয়নি। বড় ভাই চালিত সংসার। আয়না ছয় ক্লাসে উঠেই মাকে বলে একটা ফোন কিনতে পেরেছিল। মোবাইল ফোনে কথা বলা তার খুব শখ। মায়েরও শখ মেয়ে কথা বলুক। মা ছেলেকে বলে একটা টাচ-ফোন কিনে দিয়েছিল। আজব ব্যাপার। টাচ করলেই কথা বলা যায়। এতে কথা বলতে গেলে আবার ছবিও দেখা যায়। বড়ই আচানক কারখানা। আয়নামতির আনন্দ দেখে কে! টাচ-ফোনই তার আয়না। আয়নামতি এখন এর মধ্যি দিয়ে জীবনের ছবি দেখতে চায়। রঙিন বয়স। রঙিন মানুষ ছাড়া ফোনে কথা-বলা লোকের বড় অভাব। বড় ভাই তাকে ফেসবুকে একাউন্ট খুলে দিয়েছে। বিশাল জগৎ। অসংখ্য লোকের আনাগোনা। মনের কথা বলা। মনের মতো লোক খুঁজে নেবার অবাধ সুযোগ। ক্লাস সেভেনে উঠতে-না-উঠতেই ফেসবুকের মাধ্যমে রজবের সাথে পরিচয়। এ বয়সে জীবনের সব কিছুই রঙিন মনে হয়। সামনে-পিছনে ফিরে তাকানোর সময় থাকে না। শুধু একজনকে খুব আপন করে পেতে ইচ্ছে করে। ঘর বাঁধতে পারলেই স্বপ্ন সার্থক। অকূলে কূল খুঁজে পাওয়া যায়। আয়নার কাছে রজবকে জীবনের আরাধ্য বলে মনে হয়।

লেখাপড়া ঘরবাঁধার স্বপ্নময় স্রোতে ভেসে চলে গেল। রাত-দিন সময় সুযোগ বুঝে রজবের সাথে ফোনালাপই একমাত্র কাজ। এত কথা বলেও কথা যেন শেষ হয় না, আরো বলতে ইচ্ছে করে। স্কুলে যাওয়া-আসা লোক-দেখানো মাত্র।

রজবের বাড়ি আয়নার বাড়ি থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে। রজব প্রায়ই আয়নার স্কুলের পাশের গঞ্জে চলে আসে। দুজনে সারাদিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে

গল্প করে সময় কাটায়। সারারাত আবার ফোনে গল্প। ভোররাতে একটু ঘুম। বিছানা ছাড়তেই সকাল দশটা।

এইট পাশ করেই পড়াশোনা বাদ পড়ে গেল। তবু রজবের সাথে দেখা করতে মাঝে-মধ্যেই বাইরে যাওয়া লাগে। রজবের লেখাপড়ারও গতি নেই। লেখাপড়ায় মন নেই। বই নিয়ে বসতে ও পড়া নিয়ে ভাবতে আদৌ মন চায় না। এসএসসিতে পর পর দু-বার ইংরেজি ও অঙ্কে ফেল করেছে। পাসের কোনো চেষ্টা নেই। পরীক্ষা দিতে হয়, তাই দেয়। বাপ-মায়ের মন রক্ষার্থে পরীক্ষা দেওয়া। রজব এ-নিয়ে ভাবে না। ভাবে আয়নাকে নিয়ে। আর ভাবে কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যে টাকা কামাতে যাওয়া যায়। একবার গিয়ে পাঁচ বছর কামাতে পারলেই জীবন পার হয়ে যাবে। মাঠে বাপের পনেরো বিঘে জমি আছে। তিন ভাই। ভাগের ভাগ পাঁচ বিঘে জমি তো হবেই। আবার অত কী হবে! চেষ্টা করছে বিদেশ যাবার। এক বছর আগ থেকেই আদম ব্যাপারির পিছ পিছ ঘুরছে। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে কী হবে! এ দেশে চাকরি-বাকরি আছে না-কী! বৃথা খাটনি।

অনেক দিন ঘোরার পর আদম ব্যাপারি আড়াই লাখ টাকার চুক্তিতে রজবকে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যাবে কথা দিয়েছে। পেশা ঐ দেশে গিয়ে ঠিক হবে। রজব মনে মনে ভাবে– সে লেখাপড়া জানা ছেলে, যেনতেন কাজে নিশ্চয়ই তাকে কেউ খাটাবে না। সে শুনেছে, সে-দেশে সবকিছু নাকি মেশিনে করে। সে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে, সবকিছু মেশিনে হতে থাকবে। এটা এমনই-বা কী কঠিন কাজ! বাকিটুকু ওখানে গিয়ে শিখে নিলেই হবে। শরীর-স্বাস্থ্য তেমন একটা ভালো না, রাত জেগে জেগে শরীরটা একটু বিবর্ণ হয়ে গেছে। শ্যামলা মানুষ একটু কালো-রঙা হয়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে না-কি দুম্বার মাংস বেশি পাওয়া যায়। কয়েক দিন ভালোমতো খেলেই চেহারা ফিরে আসবে। চাকরিতে গিয়ে ছায়ায় বসে চাকরির কাজ ও আয়নাকে নিয়ে শতেক কল্পনা রজবের মাথায়। রাত ও দিনে আয়নার সাথে ক-বার কথা বলবে তা নিয়ে রজব ভাবে। কমপক্ষে দু-বার তো বলতেই হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই ভিসা হয়ে যাবে সংবাদ শুনে আয়না কান্না শুরু করে দিলো– আমি একলা এখেনে পড়ে থাকপো না, আমার সাথে করে নিয়ে যাতি হবে। এতদিন আমি থাকপো কী করে! আর না হয় তোমার বাপ-মাকে রাজি করিয়ে আমাদের বিয়েডা করিয়ে দিতি বলো। আমার মা-ভাই আর বেশি দিন অপেক্ষা করতি চাচ্ছে না।

–না, না। তুমি আমার জানের আয়না। তোমাকে কি আমি ফাঁকি দিতি পারি! তুমি তো জানো, তুমি ছাড়া আমার জীবন অচল। আমি তোমার বিয়ে করে রাখে যাবো। রজবও বিয়ে করতে প্রস্তুত।

এক মাসের মধ্যে অল্প ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। আয়না শ্বশুরবাড়িতে গেল। দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছে। আয়না বাপের বাড়ি এলে রজবও সাথে আসে। দিনের পর দিন শ্বশুরবাড়ি থাকে। এ নিয়ে প্রতিবেশী কেউ কিছু বলার আগেই আয়নার মা মুখ দিয়ে সামলে নেয়– জামাই এ দেশে থাকপে না-কি! বিদেশ যাবে। সব ঠিকঠাক। যে কয়ডা দিন থাকে আমার কাছেই থাক। মা আয়নার আমার সোনার কপাল! আল্লা আমার দিকি মুক তুলে তাকিয়েছে।

আয়না প্রায়-প্রায়ই রজবকে বলে– তুমি বিদেশ যায়ে যেন আমার ভুলে যাবা না। প্রত্যেক রাত্তিরি আমার সাথে ফোনে কথা বলবা। তুমি থাকপা টাওনে, আরামে। আমার কথা ভুলে যায়ো না যেন, ফোন করতি ভুলবা না যেন। শুনিচি, ঐসব দেশে না-কি কয়েক বছরের জন্যি বিয়ে করা যায়। ওসব কিছু করবা না কিন্তু। প্রত্যেক বছর একবার আসে আমার দেখে যাবার ব্যবস্থা করবা।

–তোমাকে ভুলতি পারি না-কি! তোমার নিয়েই না আমার জীবনডা কাটাতি হবে। কিছুদিন তোমাকে ছাড়ে কষ্ট করে আসি। তারপর আমাদের সুখির সংসার কেউ ঠেকাতি পারবে না।

কাজের পার্মিট-ভিসা পেতে, আদম ব্যাপারির পিছ পিছ ঘুরতে ঘুরতে রজবের আরো বছরাধিককাল পার হয়ে গেল। চিন্তায় হতাশা নেমে এলো। স্যান্ডেলের তলা ক্ষয় হয়ে যেতে থাকলো। একদিন স্বপ্নের পাসপোর্ট-ভিসার খবর হলো। বিদেশ

যাবার দিন এয়ারপোর্টে এলে ভিসাসহ পাসপোর্ট একসাথে দেবে। যাবার দু-দিন আগে ঢাকায় এসে মেডিকেল করাতে হবে।

রজব বাড়িতে মা-বাপ-ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এলো। আয়না সাথেই আছে। শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বপ্নের হাতছানিতে সাড়া দিতে দু-দিন আগেই আয়নাকে ছেড়ে ঢাকায় আসতে হলো। আদম ব্যাপারি তাকে এক আবাসিক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলো। সাথে আরো কয়েকজন। মেডিকেল হলো। হোটেলে শুয়ে প্রতি রাতেই আয়নার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয়। দু-দিন পরেই ফ্লাইট। চোখে-মুখে নতুনের স্বপ্ন।

দু-দিন অপেক্ষার পর সাত ঘণ্টার ব্যবধানে রজব সাবেক 'জাজিরাতুল আরব' পৌঁছাল। সেখান থেকে তাকে কোনো এক ছোট্ট শহরে নিয়ে যাওয়া হলো। নির্মাণশ্রমিক পদে নিয়োগ পেল। স্বপ্নের বিদেশে এসে বাস্তবতার পদশব্দে স্বপ্নভঙ্গ হলো। তার মতো অনেক বাঙালি শ্রমিক সেখানে কর্মরত। ভাষাগত দিক থেকে কোনো সমস্যা হলো না। এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে ইট-বালি-সিমেন্ট মাথায় করে বওয়ার কাজটা ভীষণ কঠিন হতে লাগলো। ইট মাথায় নিয়ে হাঁটতে গেলে রজবের কান্না আসে। বাড়িতে কোনোদিন মাথায় করে বোঝা বওয়া তার অভ্যাস না। সিমেন্টের বস্তা মাথায় করে হাঁটতে গেলে সিমেন্টের ধুলোতে চোখ ভরে যায়। জীবনের ভার বওয়া তার কাছে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সারা দিন কাজের সময় মরুর লু হাওয়া তার চোখ-মুখ ও লালিত স্বপ্নকে পুড়িয়ে দিয়ে যায়। পরিবেশ এতো নিষ্ঠুর হতে পারে রজব গ্রামে থাকতে তা কোনোদিন কল্পনাও করেনি। এসবই জীবনের নির্মম বাস্তবতা।

বারো-তেরোজন শ্রমিক একসাথে একটা বড় রুমে থাকা। গোপনীয়তার কোনো বালাই নেই। ফোনে আয়নাকে এসব কথা বলতে চায় না রজব। বলে– ভালো আছি, অনেকে সাথে থাকে, তাই বেশি কথা বলতে পারিনে। সময়মতো কথা বলবো।

সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সন্ধ্যা না লাগতেই ক্লান্তিতে রজবের ঘুম এসে যায়। অনভ্যাসের খাটনি, রজবের জীবনটা যেন বের হয়ে যায়। রাত জাগলে

পরদিন কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এতো পরিশ্রম রজব কোনোদিন করেনি, দেখেওনি। ঠেলার নাম বাবাজি। কাজে একটু গাফিলতি হলেই মজুরি কর্তন। দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি। এত অসহনীয় পরিশ্রম দেখে রজব একবার মনে মনে দেশে ফিরে আসার কথা ভেবেছিল। কিন্তু চাষি বাপের এতগুলো টাকার ক্ষতি এবং গ্রামে ফিরে গেলে লোকলজ্জার ভয়, বেকারত্ব, আয়নাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন– বিষয়গুলো ভেবে এ অসহ্য কষ্টকে হজম করতে হয় রজবের। রজব সিদ্ধান্ত নেয়– যত কষ্টই হোক, বাড়ি ফিরে যাবে না সে। আসল টাকা পূরণ করে, তারপর কিছু টাকা জমিয়ে একবারে বাড়িতে যাবে। রজব এখন বোঝে– লেখাপড়া না শিখে জীবনের কী ক্ষতি সে নিজের করেছে! আয়নার পরিবারে তার যতই দাম থাক না কেন, বাইরে তার বাজার দর কত, জীবনের বাস্তবতা কত কঠিন! এতদিনে লেখাপড়া যা করেছে, তাতে বিদেশে শ্রমিক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এতে উপার্জন কম। প্রতি রাতে আয়নার সাথে বেশি কথা বলতে গেলে সব উপার্জন ফোনের পিছনেই দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হবে। ফলে শরীর যতই ভেঙে যাক, বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে না, অবস্থার কথা অন্য কাউকে বলা যাবে না। এভাবেই টিকে থেকে উপার্জন করতে হবে। দেশের অনেকে তো এভাবেই বিদেশ করছে।

রজবের অল্প অল্প ফোনের কথায় আয়নার মন ভরে না। বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। রজবের দেশে বেড়াতে আসার কথা বললে রজব সায় দেয় না। কী পদে চাকরি করে তাও বলে না, কবে আসতে পারবে তাও বলে না। রজবের কথায় কোনো হাস্যরসের ভাব নেই। শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে বলে, আর বলে– আমি ভালো আছি। প্রতি বছর যাতি-আসতি অনেক খরচ, একবারে গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি আসপো।

আয়নার রাতের পর রাত জেগে কথা বলার নেশা তৃপ্ত হয় না। মন উসখুস করে, অস্বস্তিতে ভোগে। রাতে ঘুম হয় না। ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যায় যায় অবস্থা। রজবকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়। ভাবে, রজব তার কাছে কিছু গোপন করছে কি-না। আরো ভাবে, এত সুখের বিদেশি চাকরি, এতদিনে রজব হয়তো অনেক

মোটাসোটা হয়ে গেছে, রাতে মনের কথা অনেকক্ষণ ধরে বললে অসুবিধে কী! রাতে কথা বলতে বাধা কোথায়! সে প্রতি বছর একবার করে আসতে চেয়ে আসছে না কেন! তাহলে কি সে ওখানে যেয়ে আরেকটা বিয়ে করল! পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না!

প্রায় দেড় বছর হতে চললো রজব দেশে নেই। আসার নামগন্ধও নেই। মন ভরে কথা বলাও নেই। ক্রমশই আয়নার মানসিক অশান্তি বাড়ছে। রজব যাবেই যদি বিদেশে, তবে বিয়ে করে বছরাধিককাল থেকে গেল কেন! আয়নার এভাবে দিন পার করা ক্রমশই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সে মনের কথা কাউকে খুলেও বলতে পারে না। একটা রাত কাটানো তার কাছে এক বছর মনে হয়।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ একটা ফোন এলো। আয়না ভাবলো, নিশ্চয়ই রজব ফোন করেছে। ফোন ধরে বুঝলো ফোন রজবের না। গলার স্বর ভিন্ন। তাদের গ্রামের পাশের পাড়ার এক ছেলে, যার সাথে আয়নার ফেসবুকে পরিচয় আছে, গ্রামেও দেখা হয়। বাড়ির খবর জানা। সামনাসামনি কোনোদিন কথা হয়নি। বনেদি ঘরের ছেলে। লেখাপড়া তেমন একটা করেনি। বাপ-মা মারা গেছে, ভাইদেরও পৃথক সংসার। চাষবাস করে। একজনের সংসার, এখনও বিয়ে করেনি। এর-ওর হাঁড়িতে চাল দিয়ে রান্না করে খায়। নাম জমশের। জমিজমা কিছু নিজে করে, বাকিটা বর্গা দেয়। জমশেরের কথায় আয়না না বলতে পারলো না, এত রাতে ফোন করার কারণও জিজ্ঞেস করতে পারলো না, শুধু হ্যাঁ-হু করে কথার উত্তর দিতে থাকলো।

জমশের জিজ্ঞেস করলো– আয়না, তুমি কেমন আছো? ঘুম আসছে না, তাই এমনিতেই তোমাকে ফোন করলাম।

–না, মানে ভালোই আছি। আমারও ঘুম আসছে না, জাগেই আছি।

–তোমার সাথে ফেসবুকে আমার জানাশোনা, তোমাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। কখনো কথা বলিনি। তাই ভাবলাম, কথা বলি। রজব কবে দেশে আসপে?

–দিনক্ষণ দিইনি, হয়তো আসতি দেরি হবে।

–আমরা কথা তো বলতি পারি, তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?

–না, মানে আপত্তির আর কী থাকতি পারে! একটু ইতঃস্তত করে আয়না কথার উত্তর দিলো।

–না, বলছিলাম কি, তুমি ভালো থাকো আমি ইডা চাই। আজ থাক, পরে আবার কথা বলবো।

–আমারও ঘুম আসছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। কিছুক্ষণ কথা বলি।

বিভিন্ন কিছু এলোমেলো কথা দুজনে কমপক্ষে আধা ঘণ্টা ধরে বললো। কথায় কোনো আঁট বসলো না। উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা হলো। দুজনেরই অনেক কথা মনে আছে বলে মনে হচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে না।

প্রায়ই মাঝরাতে জমশের ফোন করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয়, ঠিক রজবের সাথে যেভাবে কথা হতো। জমশেরের সাথে কথা বলতে গেলেই রজবের মুখচ্ছবি যেন আয়নার হৃদয়পটে প্রতিবিম্বিত হয়। এ যেন একই ছবি, একটা পুরুষের ছবি।

কিছুদিন পরে মাঝরাতে অদূরে মাঠে দুজনের দেখা হওয়া শুরু হলো। মাঠে দুজনে বসে কিছু খায়। গল্প করে। কখনো জমশের আয়নার জন্য কিছু উপঢৌকন আনে, যেমন– মাথার তেল, ফিতে, শ্যাম্পু, চুলের ক্লিপ। আয়না এগুলো আগ্রহ ভরে নেয়। আয়নার মা মেয়ের খোঁজখবর নেয় না। রাত হলে অসাড় হয়ে ঘরের পিঁড়েয় শুয়ে ঘুমায়। মেয়ে রাতে ঘরের বাইরে যায়, তাও জানে না। ঘরের ভিতরে কথা হলেও ভাবে আয়না জামাইয়ের সাথে কথা বলছে। আয়না ও জমশেরের দিন ভালোই কেটে যাচ্ছে। এ জীবনে চলার কোনো ছন্দ নেই, তালসাম্য-লয় কিছুই নেই, চলার কোনো গন্তব্য নেই, শুধুই নিরুদ্দিষ্ট সামনে ধেয়ে চলা। প্রায় আট মাস হতে চললো। মাঝরাতে কখনো ফোনে, কখনো মাঠে যোগাযোগ।

কিছুদিন থেকে আয়নার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে। খাবারে অরুচি। খাবারে বমি আসে। সকালে খালি পেটে বমি হয়। আয়না

প্রথমত শরীর খারাপকে মেয়েদের শরীরের প্রাকৃতিক অনিয়ম হিসেবে ভাবলো। হোমিও ডাক্তারকে বলে ওষুধ খেতে লাগলো। তিন-মাস পেরিয়ে গেল। তার শরীরের পরিবর্তন বুঝতে পারলো। বুঝে তার গা-টা শিউরে উঠলো। ঐ দিনই রজবকে ফোন দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে আসার জন্য চাপ দিতে থাকলো। রজব তার অপারগতার কথা প্রকাশ করলো। আয়না রজবের সাথে খুব রাগারাগি করলো। রজবের কোনো বুঝ সে নিলো না। আয়না মহাসমস্যায় পড়লো। কাউকে বলতেও পারে না, অসুস্থতা ঢাকতেও পারে না। মেয়েদের এ এক জ্বালা। শেষমেশ কলঙ্কের বোঝা তো মেয়েদেরকেই বইতে হয়।

আয়না পরদিন জমশেরের সাথে মাঠে দেখা করতে গিয়ে ঘটনাটা খুলে বললো। জমশের সহানুভূতি দেখালো। কিন্তু বিয়েতে রাজি হলো না। বললো– একজনের বিয়ে-করা বউকে আমি কীভাবে বিয়ে করবো, সমাজ তো ইডা মানে নেবে না। তুমি কবিরাজি ওষোধ খায়ে একটা ব্যবস্থা নেও। না হয় হান্নান ডাক্তারের কাছে যাও। খরচ যা লাগে আমি দিচ্ছি।

দিন যেতে থাকলো। আয়নার শারীরিক পরিবর্তন মায়ের চোখ এড়ালো না। আয়নাকে তার ভেতরের কথাটা খুলে বলতে বললো। মা অনেক বলে-কয়ে আয়নাকে একজন মহিলা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। পাড়ার মহিলাঙ্গনে ইতোমধ্যেই কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে, আয়নার বমির কারণ কী? আয়নার মা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছে বটে, একটু দেরি হয়ে গেছে। জমশের সন্তান নষ্ট করার সব খরচ বহন করতে চাইলো। আয়নাও বুঝে উঠতে দেরি করে ফেলেছে। হয়তো প্রথম পোয়াতি তাই। ডাক্তার কথা দিয়েছেন, ব্যবস্থা নিতে তিনি পারবেন। কিন্তু কানাঘুষার মাত্রা গ্রামময় হয়ে গেছে। গ্রামে ঢাকে কাঠি পড়ে গেল। আয়না ঘর থেকে আর বেরোয় না। আয়নার মাও বাড়ির বাইরে বেরোয় না। দিন চলে যায়। আয়না কোনোমতেই যেন দিনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না! একবার ভাবলো, রজবের উপর অভিমান করে আত্মহত্যা করবে। অনেক চিন্তা করলো, মনে সায় দিলো না। যত কিছুই হোক, আয়না পরকালকে নষ্ট করতে চায় না। সে এখন ফাটা বাঁশের ফাঁদে আটকে গেছে।

সমাজে এখন আর সামাজিক শাসন নেই, আইনের শাসনও অনুপস্থিত। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় দলের উঠতি বখাটেদেরকে নিয়ে যে যত ক্ষমতার দাপট দেখাতে পারে, গ্রামে সে-ই বড় নেতা, তার নামই সবার মুখে মুখে। এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের দুই হালে মাস্তান– যারা রাজনীতির ছায়াতলে মাস্তানি করে খায়, ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের নেতাদের সাথে সখ্য, হাতের লাঠি হিসেবে নামযশ আছে, বর্তমান সমাজে যাদের একচ্ছত্র আধিপত্য, দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা– রাত দশটার পর আয়নাদের বাড়িতে এলো। একজনের নাম জানে আলম, অন্যজন লাল মিয়া। আয়নার মা ও ভাইয়ের সাথে শলাপরামর্শ করলো। এ ঘটনার জন্য দায়ী কে, তার নাম শুনতে চাইলো। সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে বলে জানালো। বিপদ-আপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, জনসেবা করতে নেতা-নেত্রীদের নির্দেশ আছে– তাও বললো। তিন লাখ টাকা নগদ দিতে হবে বলে জানালো। তারা টাকার ব্যবস্থা করে দিলে কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে না, তাদের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে দেবে, তাও বললো। গ্রামের সম্মান তাদেরকেই রক্ষা করতে হবে, প্রয়োজনে জমশেরকে ধরে এনে বিয়ে পড়িয়ে দেবে, এ আশ্বাসও দিলো। এ টাকার অন্য আরো অনেক খরচ আছে বলে জানালো।

জানে আলম গ্রামের সবাইকে চুপ থাকার নির্দেশ দিতে চামচাদের দিয়ে কাউকে কাউকে হুমকির উড়ো ফায়ার করলো। বললো– গ্রামের মান-সম্মান রক্ষা করাডাই বড় কাজ, তা কত্তি হবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলি কিভাবে ঠান্ডা রাখতি হয় আমরা তা জানি।

গ্রাম নিশ্চুপ। কানাকানি আছে, কারো মুখে এ বিষয়ে বড় কোনো কথা নেই। জমি বন্ধক রাখিয়ে আয়নার ভাইয়ের কাছ থেকে আপাতত দুই লাখ টাকা হাতে নিলো। পাড়ার চ্যালা-চামচাগুলোকে অল্প অল্প করে হাতখরচ দিয়ে দিলো। এভাবে প্রায় দশ-পনেরো দিন পার হয়ে গেল। আয়নামতি জমশেরের সাথে সংসার করার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকলো।

দিন পনেরো পর জানে আলম তার এক চেলাকে দিয়ে খবর পাঠালো। মাঠের কোনো এক জায়গায় এসে জমশেরকে তাদের দুজনের সাথে দেখা করার ডাক পড়লো। জমশের ভীষণ ভয়ে পড়ে গেল। এলাকা ছাড়লে কেসের ভয় দেখাতে লাগলো। ভয়ের কোনো কারণ নেই বললো। মীমাংসা একভাবে একটা করে দেওয়ার আশ্বাস দিলো। জমশের সাহস পেল। বুকে বল বাঁধলো।

গ্রাম্য নেতাদের মাথায় সমাধানের বুদ্ধিরও অভাব নেই। এসব ট্রেইনিং তারা গুরুদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত পেয়ে আসছে, বাস্তবে খাটাচ্ছে। যে কোনো কিছু একটা করে ফেললেও অসুবিধে নেই। বিপদে পড়লে তখন নিজেদের ভাগ কমে যাবে। সামাল দেওয়ার লোক আছে, বড় নেতারা ও আইনের লোক হাতে আছে। তারাই শেষ সম্বল।

জানে আলম ও লাল মিয়া ঘটনাটা মীমাংসার নামে এক রাতে জমশেরকে নিয়ে মাঠের মধ্যে বসলো। জমশেরকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে ও আয়নাকে বিয়ে করতে হবে। নইলে তার নামে কেস হবে, আজীবন জেলের ভাত খেতে হবে– এ কথা বলে জানে আলম প্রথমেই চাপ দিলো। জমশের চুপ করে বসে থাকলো, মুখে কোনো বাদ-প্রতিবাদ সাড়াশব্দ নেই।

জানে আলম হঠাৎ জোর দিয়ে বললো– কথা বলছিসনে ক্যান? বিয়ে আইনমতো হয় না-হয় সিডা আমরা দেখপো। তুই বিয়ে করবি কিনা বল? বলতে বলতেই চুল ধরে ডান হাত দিয়ে কয়েকটা চড় জমশেরের গালে বসিয়ে দিলো।

জমশের হাউমাউ করে কেঁদে উঠে জানে আলমের দু পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো– জানে আলম চাচা, আপনি আমার জানের চাচা, এবারের মতো আমার জীবনডা বাঁচান। আমার মা-বাপ কেউ নেই, বড় বিপদে পড়ে গিইচি। এ জগতে আপনারা ছাড়া আমার আর কেউ নেই, যা করতি চান করেন। বিয়েডাতে আমার আপত্তি। টাকা যা খরচ হয় আপনাদের হাতে তুলে দেবো। আপনারা আমার রক্ষা করেন।

টাকা সব দিতে চাওয়ায় জানে আলম একটু নরম হলো। বললো– ঠিক আছে, আমি বিষয়ডা নিয়ে ভাবে দেখি। তোর টাকা একটু বেশি খরচ হবে। তুই পা ছেড়ে দে।

জমশের পা ছেড়ে দিয়ে পাশে বসে কাঁদতে লাগলো। জানে আলম বললো– গ্রামের সম্মান বাঁচাতি হলি থানা-পুলিশ ঠেকানো লাগবে, দলের লোক ঠেকানো লাগবে, বড় ভাইদের হাত করা লাগবে। টাকা অনেক বেশি খরচ হবে। দিতি পারবি তো?

–হ্যাঁ দেবো। ঘাড় নেড়ে জমশের সম্মতি দিলো।

লাল মিয়া জানে আলমকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে কী কী যেন বললো। সে-সাথে বললো– টাকা চাতি অত দোটানা করিস ক্যান? সাহস করে বেশি চায়ে ফেলবি, দেকপি আদায় হয়ে যাবে। ফেলশানি কেস, অল্প টাকায় ছাড়বো ক্যানে!

জানে আলম আট লাখ টাকা দাবি করার কথা ভাবছিল। এখন লাল মিয়ার কথায় মন ঘুরে গেল। ওরা কী আলোচনা করলো, জমশের তা বুঝতে পারলো না। সে যেখানে বসে ছিল, সেখানে বসেই কাঁদতে লাগলো।

জানে আলম ফিরে এসে বললো– তোর দশ লাখ টাকা নগদ দিয়া লাগবে। আয়নার মাস চালানো খরচ মাসে মাসে আমাদের হাতে দিবি। ঠিক আছে তোর বিয়েডা আপাতত বন্ধ থাক। কিছুদিন একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকপি। টাকা জোগাড় করে দিয়ে যাবি। আমাদের সাথে সব সময় ফোনে যোগাযোগ রাখপি। টাকার কথা কাউকে বলবিনে। না-হলি তোর বিপদ হবে। টাকা জুগাড়ে অসুবিদে হলি বিলির মাঠে তিন বিঘে জমির আপাতত খদ্দের দেখ। বাকিডা পরে দেখা যাবে। তোর কোনো ঝামেলা নেই, ঝামেলা যত সব আমাদের। যা ওঠ।

–কয় দিনির মধ্যি টাকা দিতি হবে? জমশের নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলো।

–যত তাড়াতাড়ি পারিস। হাতে সময় খুব কম। আর আয়নাদের বাড়ির ওদিকি যাবিনে। আয়নার সাথে কথা বন্ধ রাকপি। –কথাগুলো বলতে বলতে দুজনে মাঠের ভাগাড় দিয়ে সামনে চলে গেল।

জমশের কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকলো। তার কেন জানি ভয় ভয় করতে লাগলো। সেও উঠে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলো।

আয়নার অবস্থার কথা ভেবে জমশেরের খারাপ লাগতে থাকলো, কিন্তু করার কিছু ভেবে পেল না। জমি বিক্রির ধান্দা করে বেড়াতে লাগলো। তিনটে গরু ও ঘরের ক্ষেত বিক্রি করে আড়াই লাখ টাকা রাতে জানে আলমের হাতে দিয়ে এলো। জমশের ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারতো। সে দেখছে তার ভিটে-বাড়ি এখানে। মাঠে ক-বিঘে জমি। সে পালালে জমিগুলো বেদখল হয়ে যাবে। নিজে তেমন লেখাপড়া জানে না। অন্য কোথাও গেলে রোজগার করে খাওয়া কঠিন। দিনমজুর হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। পালালে, তার নামে কেস হবে। পুলিশ ধরে এনে মারধর করবে, জেলে যেতে হবে। তাছাড়া এ গ্রামে বাস করতে হলে জানে আলম ও লাল মিয়াকে টাকা দিয়েই বাস করা লাগবে। নইলে জীবনের উপর হুমকি আসবে। আয়নাকে দিয়ে কেস করাবে। থানা-কোর্ট-জেল করতে করতে জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। কোর্ট-কাছারি সে ভালোমতো চেনেও না। পুলিশের পিঠমোড়া করে বেঁধে পিটুনির কথা শুনলে ভয়ে আগেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়। সব জায়গাতেই তো টাকার খেলা। হয়তো এর থেকে বেশি খরচ হবে, আবার জেলও খাটা লাগবে। তারচে এই ভালো। জানে আলম ও লাল মিয়াকে টাকা দিয়ে এবারের মতো উদ্ধার পাওয়া যাবে।

কয়েক দিন পর গ্রামেই জমির খরিদ্দার পেলো। দাম একটু কম। জমশের তাতেই রাজি। বিপদের কথা বলে ছয় লাখ টাকা নগদ অগ্রিম নিলো। বাকি টাকা দুমাস পরে নিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে দেবে। পাড়ার একজনকে সাক্ষী হিসেবে রাখলো। পাঁচ লাখ টাকা জানে আলমের কাছে পৌঁছে দিলো। বাকি এক লাখ টাকা আয়নার সাথে যোগাযোগ করে তার হাতে খরচ-খরচা বাবদ দিয়ে এলো।

জানে আলম ও লাল মিয়া এখন বেশ শান্ত। একদিন বেশ রাতে দুজনে আয়নার বড় ভাইয়ের কাছে বাকি টাকা আনতে গেল। বড় ভাই বাকি টাকা জানে আলমের হাতে দিলো। জানে আলম বললো— সরার আইন মানতি গেলি সন্তান পেটে থাকা

অবস্থায় বিয়েডা আপাতত হচ্ছে না। সরার আইন মানা জরুরি। আমাদের সবারই মরতি তো একদিন হবেই। বিয়েডা পরে দেখা যাবে। গ্রাম ঠান্ডা করতি হলি আয়নাকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখতি হবে। প্রয়োজন হলি থাকার জায়গা আমরা করে দেবো। আয়নার থাকা-খাওয়ার কোনো খরচাপাতি তোমাদের দিয়া লাগবে না। আমরা সব ব্যবস্থা করবো। গ্রামের মান-সম্মান তো এখন বাঁচাতি হবে।

জানে আলমের প্রস্তাবে আয়নার মা-বড়ভাই কোনো আপত্তি করলো না। একদিন আয়নার শ্বশুর হঠাৎ আয়নাদের বাড়ি এসে হাজির। কে খবর জানিয়েছে তা বললো না। আয়না শ্বশুরের সামনে এলো না। শ্বশুর পাড়ার দু-একজনের সাথে কথা বলে চলে গেল।

কিছুদিন পর এক রাতে জানে আলম ও লাল মিয়া আয়নাকে সাথে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছাড়লো। ঢাকায় এসে সাত দিনের জন্য একটা হোটেলে তিনজন উঠলো। ঢাকার আশপাশে কম দামে ছোট্ট একটা বাসা খুঁজতে লাগলো। বাসা একটা পেলো। গার্মেন্টসের মেয়েরা মেস করে থাকে। একটা রুম খালি আছে। সেখানে স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে বাসা ভাড়া নিলো। সে সব দিন বাসায় থাকতে পারবে না বলে জানালো। তার অবর্তমানে আয়না দেখাশোনার জন্য গার্মেন্টসের মেয়েদের সাহায্য চাইলো। জানে আলম মাঝে-মধ্যে বাসায় আসবে বলে আয়নাকে জানিয়ে এক রাত থেকে চলে গেল। ফোনে যোগাযোগ রাখতে বললো। জমশেরের সাথে কোনো যোগাযোগ করতে নিষেধ করলো। এখন শুধু অপেক্ষার পালা, নবজাতকের জন্য অপেক্ষা।

দুজনে বাড়িতে এসে জমশেরকে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে বললো। প্রতি মাসে খোরাকি বাবদ বিশ হাজার টাকা তাদের হাতে দিতে হবে। জানে আলম দলীয় কাজের দোহাই দিয়ে প্রতি মাসে দু-তিন বার ঢাকা থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। গ্রামের লোক জানে না যে, আয়না এখন জানে আলমের হাতের মুঠোয় বন্দি। গ্রামের কিছু সাথে-থাকা দলীয় পোষা মাস্তান, বখাটে ছেলেছোকরাকে টাকার

অঙ্ক কিছু কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ করাতে হয়েছে। বাকি টাকা দুজন পকেটে ভরেছে। গ্রামের এমন বিভিন্ন উৎস থেকে দুজনের আয়-রোজগার ভালো। ইউনিয়ন পরিষদের আয়-রোজগারের একটা অংশও এরা পায়। আবার গ্রাম থেকে আদায়ের একটা অংশও ওদের উপরতলার প্রতিনিধিদেরকে নিয়মিত দিতে হয়। এ ঘটনা থেকে আদায়কৃত টাকার বেশি একটা উপরতলায় দেয়নি। তাছাড়া আয়নার বাবদ আদায়কৃত মাসিক খোরাকির টাকার দশ হাজার আয়নাকে পাঠায়, বাকি টাকা দুজনে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। দুজনের দিনকাল খুব ভালোভাবে কেটে যাচ্ছে। কয়েক বছরে মাঠে কয়েক বিঘে জমিও কিনেছে। বাড়িতে ছাদ-দেওয়া পাকা ঘর উঠেছে। মহা-রাজনীতির তৃণমূল-বিস্তৃত গণতান্ত্রিক তরিকা এদের দিন ফিরিয়ে দিয়েছে। এরা দলের গুণগানে পঞ্চমুখ। রাজনৈতিক আদর্শে দেশপ্রেমী। প্রয়োজনে নেতার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।

আয়না ঢাকার এক প্রান্তের গলির মধ্যে টিনের চালার এক ঘরে একাকী বসে সামনের দিনগুলো হাতের আঙুলে গুনছে আর চোখের জল ফেলছে। এত কষ্ট জানে সয় না। জানে আলমের পাঠানো দশ হাজার টাকায় মাস চালানো খুব কষ্ট হয়। অর্ধেকের বেশি চলে যায় ঘর ভাড়া ও বিভিন্ন রকম বিল দিতে। শহুরে জীবন গ্রামের জীবন থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে কেউ কারো খোঁজ নেয় না। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আয়না বুঝতে পারে কষ্টের দিন তার কেবল শুরু। সারাদিন না খেয়ে শুয়ে থাকলেও তাকে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই, কেউ জিজ্ঞেস করেও না– তার শরীরটা কেমন আছে বা সে ভাত খেয়েছে কি-না। বার বার মায়ের কথা মনে পড়ে। মা তাকে হারিয়ে হয়তো খুব কান্নাকাটি করছে। মনে পড়ে রজব ও জমশেরের কথা। কত আশা করে রজবের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে বিয়েটা করেছিল। জীবনে এখন বিশাল শূন্যতা। শুধুই দীর্ঘশ্বাস। সব তছনছ হয়ে গেলো। লাল মিয়াও এর মধ্যে দু-বার ঢাকায় এসে বেড়িয়ে গেছে। গার্মেন্টসের মেয়েরা ফ্যাক্টরির কাজে বের হয়ে গেলে সে আয়নাকে দেখতে আসে, সন্ধ্যার আগে বেরিয়ে হোটেলে গিয়ে রাত কাটায়। লাল মিয়া এলে কিছু ফল হাতে করে নিয়ে আসে, জানে আলম তাও আনে না। একদিন কিছু বাজার করে এনেছিল।

দুনিয়ার যত দুশ্চিন্তা এখন সব আয়নার মাথায়। ভাবে– ভবিষ্যতে তার কী হবে! রজব কেমন আছে, জমশের কেমন আছে, তার বড় ভাই-মায়ের এখন অবস্থা কী, স্বাভাবিক জীবনে কি কোনোদিন আর সে ফিরতে পারবে! আর কয়েকটা মাস পর তার কী হবে! তার ছেলে না মেয়ে হবে! মোবাইল ফোন এবং ফেসবুক তার জীবনের কাল হলো! সে তো সুখের সংসার পাততে চেয়েছিল। রজব তাকে ফেলে রেখে চলে গেলো কেন! প্রতি বছর একবার এসে বেড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, এলো না কেন? মা তাকে কোনোদিন শাসন করেনি কেন? এখন তার অন্ধকার জীবন। তার সন্তানের ভবিষ্যত কী! সে নিজে ও তার সন্তান ভবিষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সে কী করে খাবে! মোবাইল ফোন-ফেসবুক খেলা না করে যদি তখন লেখাপড়াটা করতো, তাহলে এখন সে একটা চাকরিতে ঢুকলেও টাকা উপায়ের একটা পথ পেতো। মাকে সাথে নিয়ে একটা স্বাধীন জীবন পেতো। এখন এ পৃথিবীতে তাদের আশ্রয় দেওয়ার তো কেউ নেই! যেদিকে তাকায় অন্ধকার। যে ইজ্জত নিয়ে মাতৃসমাজ গর্ব করে, তাও সে হারিয়েছে। তার সাথে বাজারের মেয়েদের পার্থক্য কোথায়! জানে আলম এভাবে মাসে মাসে আর কতদিন টাকা দেবে! জমশের কি শেষমেষ তাকে বিয়ে করবে? হয়তো করবে না। খেয়ে না-খেয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চোখ-জোড়া লাল, কোটরাগত; চোখের দু-পাশে ক্রমশ ঘা হয়ে যাচ্ছে। শরীর শীর্ণকায়। উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা চক্কর দিয়ে পড়ে যায়। এভাবে বিনা যত্নে, বিনা চিকিৎসায় সে আর কদিনই-বা বাঁচবে! সন্তান হবার সময় তাকে হাসপাতালে কে নিয়ে যাবে! কে তার ওষুধ কিনে দেবে! কে তাকে দেখবে! অভিমানে মায়ের সাথেও কথা বলতে চায় না আয়না। অভিমানটা ঠিক কার উপর তা সে বুঝতে পারে না। ঢাকায় আসার পর মায়ের সাথে মাত্র দু-দিন সে অল্প কথা বলেছিল। বলেছিল, আমি ভালো আছি, আমাকে নিয়ে তোমরা ভেবো না।

আয়নাকে নিয়ে বড় ভাইও আর ভাবছে না। আয়নার এসব কুকর্ম তাকে সমাজে ছোট করেছে। কোথাও মুখ বের করার মতো নেই। এ নিয়ে মায়ের সাথে তুমুল ঝগড়া, মনোমালিন্য। সে কোনোদিনই আর আয়নার খোঁজখবর নেবে না। জানে

আলমরা একটা ভালো কাজ করেছে। টাকা তিন লাখ নিলেও আয়নাকে সরিয়ে নিয়ে তাকে অন্তত কিছুটা হলেও রক্ষা করেছে।

আয়নার মা কখনো মন বললে একটু খায়, নইলে উপোস থাকে। দেখার কেউ নেই। আয়নার মামারাও এ বাড়িতে পাড়া দেয় না। মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তা আর দুশ্চিন্তা। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটায়। মাঝে-মধ্যে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয়নার বিছানায় বসে বিলাপ করে কাঁদে– আল্লা আমার মরণ দেয় না ক্যানে! কখনো মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে ভাবে– সময় হলে জানে আলমকে বলে বাপের বাড়িতে যাওয়ার নাম করে না-হয় দু-তিন মাস আয়নার ওখানে গিয়ে থাকবে। কিন্তু টাকা দেবে কে! টাকা ছাড়া সে অসহায়! 'আ হা! তুই ক্যান এমন কাজটা করতি গেলি মা। তুই আট কিলাস পড়া মেয়ে, তুই কি জানতিসনে মা, অল্প বয়াস থিকেই মেয়েলোকের সজাগ হতি হয়, কলঙ্ক সব সময় আইসে মেয়েলোকের মাথায় পড়ে!'

দলীয় কাজের নামে জানে আলমের ঘন ঘন ঢাকায় আসাতে তার স্ত্রীর সন্দেহ হলো। একদিন রাতে স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো– তোমরা দুজনে মিলে আয়নাকে কি ঢাকায় রাখে আয়েছো? সেখেনে যাওয়া-আসা করো? আমার কাছে বুলতি অসুবিধে কী? আমি জানি, তোমরা তাই করেছো। আমার মনডা তাই বলছে। তোমার সংসারের মুখি বা-পার লাথি মারে আমার দু চোখ যেদিক যায় চলে যাবো; না-হলি গলায় দড়ি দেবো। তুমি গিরামের লোক নিয়ে রাজনীতি যত করবা করো, আমার নিয়ে করবা না। এত ঘন ঘন ঢাকায় যাতি হবে কেন?

–না না, আমরা আয়নার রাখতি যাবো কেন! আয়নাকে তার মামুরা সরিয়ে নিয়েছে। আমরা ওর মধ্যি নেই। যা করিছি গ্রামের মান-সম্মানের দিকি তাকিয়ে করিছি। এখন ওদের ঝামেলা ওরা বুঝুক। আমি আমার মাথার কিরে কাইটে বলছি, আমি আর ওর মধ্যি নেই। জানে আলমের টাটকা উত্তর।

–তুমি আর ঢাকায় যাতি পারবা না। ইর পর থেকে আর বাইরি রাত কাটাতি দেবো না। তোমাদের আমি বিশ্বাস করিনে। তাহলি কিন্তু সংসারে আগুন ধরিয়ে দেবো।

স্ত্রীর মুখের কাছে জানে আলম কোনোমতেই টিকতে পারলো না। জানে আলম যতই তর্ক করুক, তার মনের দুর্বলতা কথা দিয়ে ঢাকতে পারছে না। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দিন দিন বাড়ছে। মনে মনে বলছে– ঐ মেয়েলোকের কথায় অত কান দিতি গেলি দুনিয়া চলে না।

জানে আলম ও লাল মিয়া আয়নাকে নিয়েও ভাবছে। চিন্তা তাদেরও আছে। দুজন একসাথে বসে পরামর্শ করে– ছয় মাস পর জমশেরকে গ্রামে ফিরিয়ে আনতে হবে। আয়নাকে আর ফেরত আনা যাবে না। আয়নার সন্তানকে কোনো এক এতিমখানায় দিয়ে দিলেই হবে। আয়নার চেহারাটা একেবারে খারাপ না। তাকে কোনো খারাপ পাড়ায় বেচে দিলেও কিছু নগদ টাকা আসবে। আর তাকে ফুসলিয়ে ভারতীয় দালালদের হাতে তুলে দিতে পারলে টাকাটা হয়তো একটু বেশিই পাওয়া যাবে।

(পল্লবী, ঢাকা: ০৭.০৬.২০২১)

শিক্ষা আলাপন– অনলাইন

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষামানের অবনতির ধাক্কা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। তাছাড়া না-পড়ে সনদপত্র নেবার মানসিকতা এ-দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও চলে এসেছে। আবার কোভিড-১৯ অধ্যাপক ড. ফটিকুর রহমানের (এফ রহমান) ক্লাস নেওয়ার ও শিক্ষা দেওয়ার পরিশ্রম অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে প্রতিটা অধ্যায় শেষে একটা ক্লাস টেস্ট নিতেন অধ্যায়ের মূল ধারণাসংক্রান্ত বিষয়গুলো বোধগম্য হয়েছে কি-না দেখার জন্য। এর সাথে মিড-টার্ম পরীক্ষা। এছাড়াও ফাইনাল পরীক্ষা। এতে প্রথম থেকেই ছাত্রছাত্রীরা পড়ায় মনোযোগী হতে বাধ্য হতো; অনেক অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীও কিছুটা হলেও পড়তো। তবে সেখানেও অনেকে বই পড়তে চাইতো না কিংবা পড়ায় নানাভাবে ফাঁকি দিতো। নানা কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে ভালো গ্রেড চাইতো। এফ রহমান এতে কর্ণপাত করতেন না। তিনি প্রতিটা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার্জনের মাধ্যমে জীবন গড়ার অনুপ্রেরণামূলক কথা বেশি বেশি বলতেন। নিজের চেষ্টা ও পড়ানোর নীতিমালা ধরে সাধ্যমতো শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতেন। ভালো ছাত্রছাত্রীরা সাথে থাকতো। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ লেখাপড়ায় এগিয়ে আসতে বাধ্য হতো।

চলতি সমাজব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের বই পড়া ও শেখার আগ্রহ কম। কোনোমতে গ্রেড পেয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চায়। কখনো ভালো গ্রেডের জন্য শিক্ষকের নামে মিথ্যা দুর্নাম ছুড়ে দেয়। নিজের যে শেখার ইচ্ছে নেই, বইটা ছুঁতে মনে চায় না, আদৌ লেখাপড়া করে না, সেটা বিবেচনায় আনে না। এগুলো করে শিক্ষকের পড়ানোর মানকে নীচে নামিয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষও ছাত্রছাত্রীদের সব কথার গুরুত্ব দিতে গিয়ে নিজেদের অজান্তে প্রতিষ্ঠানের মানকে ক্রমশই হারায়। না বুঝে ভালো ভালো শিক্ষকদের উপর অযথাই খবরদারি ফলায়। শিক্ষকদের হতোদ্যম করে ছাড়ে। কিছুসংখ্যক ফাঁকিবাজ-মতলববাজ শিক্ষক কর্তৃপক্ষের তালে তাল দেয়।

সমীকরণটা বুঝতে পারে না। লেখাপড়া করতে না-চাওয়া ছাত্রছাত্রীরা এতে প্রশ্রয় পায়। আরো শিক্ষা-উদাসীন হয়। এভাবেই শিক্ষাহীন মন-মানসিকতা গড়ে ওঠে। না পড়েই সনদপত্র চায়। সনদপত্রটা নিয়ে বেকার হয়ে পথে পথে ঘোরে। নিজের পরিণতির জন্য যে সে নিজেই দায়ী, এই বোধ কোনোদিনই জন্মায় না। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম অথচ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়াতে এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ না-করাতে এ-এক উভয় সংকট অবস্থা।

কোভিড-১৯ আসাতে অনলাইন লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছাত্রছাত্রীরা হালে আরো পানি পেয়েছে; তাদের পোয়াবারো। এতে যেন এক পক্ষ না-পড়েই বিভিন্ন অজুহাতে ভালো নম্বর পেয়ে পাস করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে; আরেক পক্ষ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বন্ধ করতে ও শিক্ষার মান সাধ্যমতো ঠেকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। অভ্যাস নষ্ট করা অনেক সহজ, ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন। এ এক বাঘে-মহিষে টানাটানি অবস্থা।

আজ সেমিস্টারের মাঝামাঝি সময়ে এ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী কর্তৃক জমা-দেওয়া অ্যাসাইনমেন্টের উপর জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার জন্য এফ রহমান তাদেরকে আসতে বলেছেন। এফ রহমান মৌখিক পরীক্ষা নেওয়াতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নাখোশ। কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে, কপি-পেস্ট করে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া যায়। মৌখিক পরীক্ষায় তো আর তা চলে না। ফলে ভিন্ন অজুহাত খুঁজতে হয়। তিনি জানেন, বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অনেকেই অনুপস্থিত থাকবে। তবু পরীক্ষা নিতে হবে। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদেরকে অপেক্ষমাণ রুমে রেখে একজন একজন করে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকবেন তিনি। প্রথম জনকে ডাকতে গিয়ে অপেক্ষমাণ রুমে তিনি ঢুকলেন। ছাত্রছাত্রীরা জানে না এফ রহমান অপেক্ষমাণ রুমের কথা এখন শুনছেন। অনেকে অনেক কথা বলছে। কিছু কিছু কথা এরকম:

–অ্যাসাইনমেন্ট যত পারে স্যার দিক না কেন, আমাদের আপত্তি নেই। ইন্টারভিউ নিতে চাওয়াটা আদৌ ভালো হচ্ছে না। স্যার এই করোনার সময়ে একটু বেশি বেশি খাটাচ্ছে। গত সেমিস্টারেও নাকি অনেককেই স্যার ফেল করিয়ে দিয়েছেন।

এটা আদৌ উচিত হয়নি। আগে জানলে তার কোর্স নিতাম না। অ্যাসাইনমেন্ট বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করে জমা দিয়েছি। ইন্টারভিউ তো আর সেভাবে হয় না! স্যার বড্ড বাড়তি ঝামেলার মধ্যে ফেলে দেন। করোনার মধ্যে এত লেখাপড়া করার আমাদের সময় কোথায়!

কেউ বলছে– একটা সার্টিফিকেট পেলেই চাকরির দরখাস্তটা করতে পারি। প্রতি সেমিস্টারে এতগুলো টাকা দিচ্ছি, আবার পড়তে হবে কেন! স্যার ক্লাসে বক্তৃতার স্লাইড দিলেও একটু দেখে আসতে পারি। উনি তা না দিয়ে বইয়ের প্রতিটা টপিক ধরে ধরে উদাহরণ দিয়ে পড়ান। এভাবে হয় না। বই পড়ার সময় আমার আছে না-কি! ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকার ধৈর্যও আমার নেই। স্যারের বক্তৃতার ভিডিও এলএমএস থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছিলাম শুনবো বলে। সময় হয়নি। অ্যাসাইনমেন্টের উপর ইন্টারভিউ তো নেওয়া না, ফেল করানোর বুদ্ধি। প্রতিটা অধ্যায়ে দুটো করে অঙ্ক করে দিয়ে পরীক্ষায় সেগুলো দিয়ে দিলেই পারেন। কোনো কোনো শিক্ষক তাও তো করেন। আমরা পরীক্ষার সময় অঙ্কগুলো ডাউনলোড করে নিয়ে দু-ঘণ্টার মধ্যে বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা নিয়ে খাতায় উঠিয়ে এলএমএস-এ আপলোড করে দিতে পারি। তাতে লেখাপড়াও হয়, আবার আমরাও পাস করি। স্যার আসলে ব্যাক-ডেটেড। আধুনিক যুগের পড়া পড়াতেই জানেন না। স্যারদের জানা উচিত আমাদের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় চলে। প্রয়োজনে আমরা দল বেঁধে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে সময়মতো বলবো অথবা ফেসবুকে লিখবো। তোমরা সবাই সাড়া দিও। যখন শিক্ষক মূল্যায়নের সময় আসবে, তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করবা। কী লিখতে হবে আমি বলে দেবো।

এফ রহমান ছাত্রছাত্রীদের অনেক কথাই শুনলেন। দেখলেন, যে বা যারা কোনোভাবেই করোনা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নয়, তারাও করোনার দোহাই দিয়ে পার পেতে চায়। না শোনার মতো ভাব দেখিয়ে একটা আইডি উল্লেখ করে এক নম্বর সিরিয়ালকে সেশন রুমে ইন করতে বললেন, ওয়েব ক্যামেরা অন করতে বললেন। দেখলেন, ছাত্রটা ক্যামেরা অন না-করার অনেক অজুহাত খুঁজলো। কোনো অজুহাতই কাজে লাগলো না। শেষে ইতঃস্তত করতে করতে ক্যামেরা অন

করতে বাধ্য হলো। অনেক জনেরই একই অবস্থা। কেউ কেউ কিছু টপিকের উত্তর খাতায় লিখে নিয়ে এসেছে, সামনে রেখেছে। সেদিকে বার বার তাকাচ্ছে। কেউবা প্রশ্ন করার সাথে সাথে দু-তিনটা মূল শব্দ কম্পিউটারে লিখে সার্চ দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে পড়ে পড়ে এফ রহমানকে শোনাচ্ছে। এফ রহমান সবই বুঝতে পারছেন। তিনি তাদেরকে অন্য দিকে তাকাতে নিষেধ করছেন। অন্য কোথাও কথাগুলো লিখে রেখেছে, সেদিকে মনের অজান্তেই চোখ চলে যাচ্ছে, এটা তো সাইকোলজিক্যাল বিষয়। তিনি তাদের কথা বলার সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিতে বলছেন। কেউ বিষয়টা মুখে উচ্চারণ করতে পারলেও একবার শিক্ষকের দিকে ও একবার লিখে রাখা নোটের দিকে তাকাতে গিয়ে দোটানায় পড়ে খেই হারাচ্ছে, কিছুই উত্তর দিতে পারছে না। এফ রহমান মূল ধারণার উপর প্রশ্ন না করে প্রত্যেককে তিনটা অধ্যায়ের অ্যাসাইনমেন্ট প্রস্তুত করতে গিয়ে কী কী শিখেছে, জিজ্ঞেস করছেন। কিছু বলতে পারলে সে বিষয়ের উপর আরো প্রশ্ন করছেন। কিছু বলতে না পারলে অধ্যায় তিনটার নাম জিজ্ঞেস করছেন। তা-ও না পারলে সাবজেক্টটার নাম, টেক্সট বইটার নাম, লেখকের নাম জিজ্ঞেস করছেন। কেউ কেউ মোটামুটি ভালো শিখেছে বোঝা যায়। কারো কারো টপিক সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ধারণা। অনেককেই দেখলেন, লেখাপড়ার সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই, বইটাও ছোঁয়া হয়নি। অনেকে বিষয়টা অকপটে স্বীকারও করলো। এফ রহমানের মন ও মেজাজ দুটোই ক্রমশই খারাপ হয়ে গেল। ভাবতে লাগলেন, এই অবস্থাটা যদি এখন কর্তৃপক্ষের কোনো লোককে দেখাতে পারতেন! হয়তো তাদের উপলব্ধিতে ছাত্রদের না-পড়ার বাস্তবতা অনুভূত হতো। শিক্ষককে কথায় কথায় ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়ানোর মুখস্থ হেদায়েত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। কেউ কেউ বুঝতে চায় না যে, ঠেলাগাড়ি হলে ঠেলে দেওয়া যায়; একজন ছাত্র/ছাত্রী আদৌ বই না ছুঁলে, পড়তে না চাইলে জোর করে শেখানো যায় না। লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকতে হয়।

অনেক সময় দিয়ে সাধ্যমতো শেখানোর চেষ্টার পরও অনেক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ায় উদাসীনতা, অমনোযোগিতা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া এফ রহমানকে খুব মানসিক কষ্ট দেয়। তার এ মনস্তাপ বোঝার মতো লোক এ সমাজে অনেক

কম। বর্তমান সমাজে অনেকেই নেগেটিভ বিষয় নিয়ে বেশি টানাটানি করে। অনেকেই নির্বোধের মতো যুক্তি খাড়া করে, তর্ক করে। এ সমাজের এটা চলতি রীতি। বেশ কয়েক বছর থেকেই তিনি অনেক আশা করে, অনেক প্রস্তুতি নিয়ে নতুন সেমিস্টার শুরু করতে যান। সেমিস্টার যত শেষের দিকে যেতে থাকে, হতাশা ও দুরাশার কালো চাদর তাঁর প্রত্যাশার মুহূর্তগুলোকে ক্রমশই ঢেকে দিতে থাকে। কেউ শিক্ষা নিতে অনীহ হলে তাকে কোনোমতেই শিক্ষা দেওয়া যায় না। একসময় সেমিস্টার শেষ হয়ে যায়। খাতা দেখা, ফলাফল তৈরির দিনগুলোতে মনটা খুব খারাপ থাকে। রাতে ঘুম হয় ন। পেশা বদল করতে ইচ্ছে করে। নানা কারণে তা পারেন না। আবার আশায় বুক বাঁধেন, মনকে প্রবোধ দেন। তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা নিয়ে কম-বেশি নিরাশ। এভাবেই আশা-দুরাশার দোলাচলে দুলতে দুলতে অবসরের দিনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আটত্রিশ বছর শিক্ষকতার পর বর্তমানে এ পেশাতে বড়ই হতাশ বোধ করেন। আগে ভালো শিক্ষক ছিলেন, এখন দিনে দিনে খারাপ হয়ে যাচ্ছেন– এ কথা তিনি মানতে নারাজ।

ইন্টারভিউ শেষ হবার আগেই দেখলেন আজ অনেকেই অনুপস্থিত। ক্লাসে দুজন শ্রেণি-প্রতিনিধি আছে। একজন মেয়ে, অন্যজন ছেলে। এভাবে দুটো সেকশনে চারজন শ্রেণি-প্রতিনিধি। তাদেরকে নতুন দিন ও সময় দিয়ে বললেন যারা আজ আসেনি তাদেরকে ঐদিন উপস্থিত থাকতে। ইন্টারভিউ সেশন শেষ হলে আজ তাদের চারজনকে অনলাইনে থাকতে বললেন। তাদের মতামত নিতে চান।

ক্লাস প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ছাত্রছাত্রীরা এত অসন্তুষ্ট কেন?

–না স্যার, আপনি তো জানেন, ওরা পড়তে চায় না। বিভিন্নভাবে চেয়ে-চিন্তে বা নোটবই দেখে অ্যাসাইনমেন্টগুলো জমা দিয়েছে। এখন অ্যাসাইনমেন্ট থেকে কী শিখলো যাচাইয়ের জন্য আপনার সামনে আসতেই তাদের যত আপত্তি। ওরা তো কোনোদিনই লেখাপড়া করে অভ্যস্ত না। গণহারে ভর্তি করাতেই যত অসুবিধে। খুব কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করতে চায়। অনেকে বইটাও ছুঁতে চায় না।

বাকিরা আপনাদের কথার রেকর্ড শুনে পাস করতে চায়। ক্লাসে তো উপস্থিত থাকেই না। আবার রেকর্ডটাও শুনতে চায় না। লেখাপড়া একেবারেই করতে চায় না। আবার ভালো গ্রেড পেতে চায়। ইন্টারভিউতে এলেই তো ধরা পড়ে যাবে তাদের অবস্থা, তাই এত অসুবিধে। ফাইনাল পরীক্ষায় অনেক ছোট ছোট ধারণামূলক প্রশ্ন করতে চেয়েছেন, এতে আরো অসুবিধে। ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন করলে তো প্রশ্নোত্তর 'ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ' করতে দেবেন না। তাছাড়া মৌলিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে এলএমএস-এ ক্যামেরার সামনে বসে অল্প কথায় উত্তর লিখতে হবে। ইন্টারনেট গ্রুপের মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে বসে একসাথে মিলেমিশে বা অন্য পথে উত্তর লিখে স্ক্যান করে দু ঘণ্টা পর আপলোড করে জমা দেওয়া যাবে না। তাই এত আপত্তি। আমাদের চারজনের উপরেও খুব চাপ যাচ্ছে। আপনাকে বলে পরীক্ষায় বড় তিন-চারটে থিয়োরি কিংবা অঙ্ক দেওয়ার জন্য। দু ঘণ্টা পর খাতা জমা নেওয়ার জন্য। ক্যামেরা অন রাখতে বললে তাদের প্রেসটিজে বাধে। খোঁড়া অজুহাত খোঁজে।

–না, আমি দেখেছি, যত কঠিন অঙ্কই অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে বাসায় করতে দিই না কেন, তারা তা করে টিপটপ জমা দেয়। অনেক সময় আমি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে সহযোগিতা করতে চাই, ওরা আদৌ আসে না। সহযোগিতা নেয় না। আবার পরীক্ষাতে অতি সহজ অঙ্ক দিয়েও নকল না করতে দিলে উত্তর দিতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষায় কিছু পারে না। এর মোজেজা বোঝা আমার জন্য দুঃসাধ্য। তবে এই ইন্টারভিউ ও ফাইনাল পরীক্ষার মাধ্যমেই ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার মান যাচাই করে নেবো। এতে কে কতটুকু শিখলো উন্মোচন হয়ে যাবে। কে কে ভালো করবে এখনো আমি বলে দিতে পারি, তবু একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে হোক। আদৌ পড়বো না, আবার বেশি নম্বর চাইবো, এটা কেমন মনোভাব! আমাদের প্রতিষ্ঠানে আগেও খারাপ মানের ছাত্রছাত্রীকে আমরা অনেক পেয়েছি। তাদেরকে বিনা শিক্ষায় পার পেতে আমরা কোনোদিনই দিইনি। তাদেরকে ভালোভাবে কাউন্সিলিং করিয়ে, আমাদের মনমতো লেখাপড়া শিখিয়ে, আমাদের বাঞ্ছিত পর্যায়ে এনে গ্রেড দিয়েছি। তারাও এখান থেকে শিখে গিয়ে জীবনে উন্নতি করতে পেরেছে। ওরা যা চায়, সে মতো চলতে গেলে তো শিক্ষা বলতে কিছু থাকে

না। ওরা তো শিক্ষার মান ও শিক্ষককে শুইয়ে ফেলতে চায়। গলায় পাড়া দিয়ে পুরো শিক্ষাপদ্ধতি নিঃশেষ করে ফেলতে চায়। রোগী ওষুধ খেতে না চাইলে ডাক্তার চিকিৎসা করবেন কীভাবে? ওষুধ-না-খেতে-চাওয়া রোগীর কথামতো চলতে গেলে তো চিকিৎসা ফেল করবে। এরা আমাদের কাউন্সিলিং নিতে চায় না। আমাদের পড়ার মানকে নামিয়ে তাদের পর্যায়ে নিতে চায়। প্রয়োজনে দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা লিখে বা বলে নম্বর পেতে চায়। পরিবেশ নষ্ট করে দিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানকেও ধ্বংস করতে চাচ্ছে। বিষয়টা নির্ভর করে কর্তৃপক্ষের বোধোদয়ের উপর।

–স্যার, কর্তৃপক্ষ তো আমাদের মতামত নিতে পারে। কর্তৃপক্ষ ওদের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। ওরা যে আদৌ বই ছুঁতে চায় না, এটা বোঝে না। আমরা তো শিক্ষার মানের অবনতি চাইনে। এতে আমাদের ভবিষ্যৎ ক্ষতি। করোনার কারণে সুযোগটা ওরা বেশি পেয়েছে। আপনারা সুযোগ না দিলেই হলো। এতে ভালো ছাত্রছাত্রীর ভর্তি ক্রমশই কমে যাবে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা তো কোনো ভালো ছাত্রছাত্রীকে এখানে ভর্তি হতে বলবো না।

–কর্তৃপক্ষ ওদের কথাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণ ওরা সংখ্যায় বেশি। আমিও সে-কথাই বলি। মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীসহ তোমাদের মতামত কর্তৃপক্ষ নিতে পারে। সে-সাথে ক্লাস রেকর্ডগুলো বাজিয়ে কর্তৃপক্ষের কেউ শুনে শিক্ষকের মান মূল্যায়ন করতে পারে। এতে স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়। প্রকৃত বিষয়টা বোঝা যায়। তা না করে শুধু কতিপয় ছাত্রছাত্রীর যোগসাজশের মূল্যায়নের উপর জোর দিয়ে শিক্ষকদেরকে ডেকে নিজেদের পরিবর্তন হতে বললে বেশির ভাগ শিক্ষক মনোবল হারিয়ে ফেলবে। শিক্ষার মান আরো কমে যাবে। মতলববাজ ছাত্রছাত্রীরা এতে লাভবান হবে। এতে সেই রূপকথার গল্পের মতো রাজকন্যা হবে দাসী আর দাসী হবে রাজকন্যা। মাঝখান থেকে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাবে। চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে, কানে হাত দিয়ে না দেখে চিলের পিছ পিছ দৌড়ানো ঠিক হবে না। কর্তৃপক্ষের আরো দূরদর্শী হওয়া প্রয়োজন। কতিপয় অপ-মানসিকতাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ফাঁদে পড়ে প্রতিষ্ঠানের মানকে নষ্ট করা উচিত না। এভাবে

প্রতিষ্ঠানের মান নীচে নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। শিক্ষকদের পড়ানোর মান ইশারা-ইঙ্গিতে কমাতে না বলে নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীদের কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। মান ধরে রাখার কৌশল বের করা উচিত। সিলেবাস অনুযায়ী টেক্সট বইয়ের প্রতিটা টপিক ধরে ধরে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে পড়ালে যেসব ছাত্রছাত্রী পড়ানোর ভুল ধরে, তারা তো বই পড়তেই চায় না। শুধু স্লাইড চায়। তাদের ছাত্রত্ব থাকে কী করে!

–স্যার, এ দুয়ের মাঝে পড়ে আমাদেরকে ভুগতে হচ্ছে। আমাদের মতো বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর এই পড়াই শেষ না। আমরা এর পরও পেশাগত ডিগ্রি নেওয়ার আশা রাখি, যেখানে অনেক প্রতিযোগিতা। আমরা না শিখে সেখানে গেলে প্রতিযোগিতায় হেরে যাব। ওরা তো লেখাপড়া শিখতে আসেনি, এসেছে যেনতেনভাবে সার্টিফিকেটটা নিতে। ওদের কথামতো আপনারা চললে তো আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের সাথে তো আমাদের মেশালে চলবে না। যদিও ক্লাসে ওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

–ওরাও যেহেতু আমার ছাত্র, আমি ওদেরকেও শেখাতে চাই। কাউন্সিলিং আওয়ারে ওদেরকে কাউন্সিলিং করিয়ে ও পড়িয়ে উপরে উঠাতে চাই। ওরা তো আসে না। যত সহজ প্রশ্নই করি না কেন ওদের মন ভরে না। ওরা বিপথে নম্বর অর্জনের মওকা খুঁজতে চায়। কর্তৃপক্ষকে ফুসলিয়ে আমার দোষ ধরতে চায়। দোষটা মূলত আমি ওদের দিইনে। সত্যি বলতে কি, এ দেশ মিথ্যার দাপটে চলছে। কর্তৃপক্ষও চায় না ওরা লেখাপড়া শিখুক। কর্তৃপক্ষ চায় শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করতে। তাদের লাভ কোনটাতে, সেটা তারা বিবেচনা করে। আবার অল্প বয়সের কারণে, বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে কিংবা বলা যায়– হুজুগে মেতে অনেক ছাত্রছাত্রী না বুঝে, না পড়েই সনদপত্র নেওয়ার চেষ্টা করে। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে নষ্ট করছে। এ দেশে এদের সংখ্যাই বেশি। এরা আগেও লেখাপড়া না শিখে উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছে, এখানেও পড়তে চায় না। শেখার মনোভাবও নেই। আবার স্নাতক পর্যায়ের লেখাপড়া শেখার ও বোঝার জন্য যে ভিত্তিজ্ঞান এদের থাকা দরকার, তাও নেই। এরা না জানে লিখতে, না জানে পড়তে। না আছে কোনো বিশ্লেষণ সক্ষমতা, না আছে সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা, না আছে

মানসিক পরিপক্কতা। যেটুকু নৈতিকতা শিক্ষা নেওয়া দরকার, তাও নেয়নি। জোর করে তো আর হরির নাম কানে দেওয়া যায় না। শিক্ষায় মনোযোগেরও বড্ড অভাব। শুধু জানে, কীভাবে ফেসবুক চালাতে হয়, আর রাতের পর রাত জেগে ফোনে কথা বলে কীভাবে শরীর বিবর্ণ করতে হয়। এদের মধ্যে যে প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ছিল, তাও না-শিখেই-পাস পরিবেশের কারণে এবং বিরূপ পারিপার্শ্বিকতার কারণে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়নি। সম্ভাবনা জীবন পথের চলতি বাঁকে কীভাবে যেন হারিয়ে গেছে। এভাবে জনগোষ্ঠীর একটা বৃহদংশ অবিকশিত ও সনদসর্বস্ব অশিক্ষিত রয়ে যাচ্ছে। এরা এই অবিবেচক মানসিকতা নিয়েই সমাজের কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। সমাজে সুশিক্ষিত, বিবেকবান ও দক্ষ জনগোষ্ঠীর অভাব ক্রমশই দেখা দিচ্ছে। দেশীয় মূল্যবোধের মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের যে শাশ্বত ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, তা-ও যেন কোথায় ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষার সনদপত্র পেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক ও অনৈতিক বাজার-চাহিদার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে শোষণ ও স্বার্থসাধন করছে। টাকার বিনিময়ে অবিকশিত শিক্ষার্থীর হাতে নিজ-স্বার্থে নামমাত্র একটা সনদপত্র ধরিয়ে দিয়ে জাতিকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এটা এ দেশে শিক্ষা-ব্যবসা নামে পরিচিত। এটা আমাদের সমাজ-সংগঠকদের বিকৃত চিন্তাধারার অনিবার্য পরিণতি। এরা ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে জেগে ঘুমাচ্ছে।

–স্যার, পরীক্ষায় শুধু অঙ্ক দেবেন, না থিয়োরিও দেবেন?

–না, আমি তো ক্লাসে বলেই দিয়েছি, থিয়োরির জন্য কনসেপচ্যুয়াল শর্ট প্রশ্ন দেবো, যাতে এলএমএস সফটঅয়্যার ব্যবহার করেই সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া যায় এবং যার উত্তর ইন্টারনেট ঘেঁটে খুঁজেও পাওয়া না যায়। বিষয়ের উপর ধারণা থাকা লাগবে। বইটা ভালোমতো পড়লেই হবে। নিজের ভাষায় সংক্ষেপে দু-তিন লাইনে লিখতে হবে। তাছাড়া পরীক্ষার সময় ক্যামেরা অন রাখতে হবে। অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তো দেখলাম, অধিকাংশই ইন্টারনেট থেকে বা বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ না-বুঝেই হুবহু কপি করেছে। নম্বর দিতে না চাইলে প্রায় সবাই ফেল করে, তখন তো আরেক বিপত্তি। তারা অন্য জায়গা থেকে দেখে লিখেছে, প্রশ্ন করার পর উত্তর দিতে না পেরে অনেকে এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কেউ

কেউ বলেছে– তখন পারতো, এখন ভুলে গেছে। আসলে আমি তো দেখছি, যারা লেখাপড়া করে তারা অন-ক্যাম্পাসেও করতো, এখনো করে। ফাঁকি যারা আগে দিয়েছে, এখনো দিতে চাচ্ছে। তবে ফাঁকি দেওয়ার মনোভাবসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী বেড়েছে। অন্যান্য দেশে তো সফটঅয়্যার ব্যবহার করে অনলাইনে ভালোভাবে পরীক্ষা নিচ্ছে। হয়তো প্রশ্নের ধরন কিছুটা বদলেছে। এ দেশেও তা সম্ভব। পার্থক্য হলো– অন্য দেশে শিক্ষার মানের সাথে কর্তৃপক্ষ কোনো আপস করে না, আমরা তা করি। আমাদের অনেকে জেগে ঘুমায়। আমরা বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল করার সুযোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বড় করেছি। তাদেরকে এ কাজে অভ্যস্ত করে তুলেছি। না-পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মন-মানসিকতা এভাবেই গড়ে উঠেছে এবং এদের সংখ্যাই বেশি। এ দেশে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও আপসমূলক। তাছাড়া আমাদের শিক্ষকসমাজের একটা বড় অংশ ছাত্রছাত্রীদের এই অপ-মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং এই অবৈধ সুযোগ-সুবিধার পক্ষে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলে আধুনিক উদারমনা হিসেবে নিজেদের জাহির করে তৃপ্তি পায়। এখন এই পর্যায়ে এসে তাই ফাঁকি দিয়ে পাস করতে চায়। এতে ভালো ছাত্রছাত্রীদের আমরা নিজ হাতে নষ্ট করে ফেলছি। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। যারা অনুকূল পরিবেশ পেলে লেখাপড়া করতো কিংবা করতে বাধ্য হতো, এখন আর করতে চাচ্ছে না। আমাদের প্রশ্নের মান কমাতে কমাতে আর কমানোর জায়গা নেই। এবার তোমরা কর্তৃপক্ষকে বলো, ঐ-সব ছাত্রছাত্রীকে করোনা টিকার সাথে সাথে এক ডোজ করে হোমিও ওষুধ খাওয়াতে, যাতে ওদের লেখাপড়ার ইচ্ছেশক্তি বাড়ে। এতে আমরা যারপরনাই উপকৃত হই।

–কনসেপচুয়াল শর্ট প্রশ্নতেই তো ওদের সমস্যা। আরো সমস্যা প্রশ্নোত্তর ‘ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ’ না করতে দেওয়া। বড় বর্ণনামূলক লেখা বা অঙ্ক ডাউনলোড করে নিয়ে উত্তর দেওয়ার সময় বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে ইন্টারনেটে শেয়ার করে উত্তর তৈরি করা ছাড়াও আরো অনেক সুবিধা ওরা ব্যবহার করে।

–হ্যাঁ, আমিও বুঝি। অনেকের কাছে শুনেছি। অন্য একজন বড় ভাই, যার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালো দখল আছে, অঙ্ক ভালো পারে– কেউ-না-কেউ তাকে কোচিং সেন্টার থেকে ভাড়া করে আনে। এরা প্রশ্নটা ডাউনলোড করেই তার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সে অঙ্কগুলো করে দেয় এবং ইন্টারনেট গ্রুপে পোস্ট করে। ওরা দেখে দেখে একটু পরিবর্তন করে অনেক সময় নিয়ে লিখে যথাসময়ে জমা দেয়। অনেক সময় বার বার সময় বাড়াতে বলে। নিজের মন থেকে লিখলে এত সময় তো লাগার কথা না। বিষয়টা আমি লক্ষ করেছি, একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে ধরো পাঁচ মিনিট লাগার কথা, ওদেরকে দশ মিনিট দেওয়ার পরও আরো অনেক সময় ওরা দাবি করে। বাইরে থেকে উত্তরটা প্রস্তুত করে আনাতে হয় বলেই সময় বেশি লাগে। এটা কে না বোঝে! বই ছোঁবো না, আবার বেশি নম্বরের আশা। বদ্ধ পাগল ছাড়া এ ধরনের আশা কেউ করতে পারে? আমরা অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়ে লেখাপড়ার পরিবেশকে নষ্ট করে ফেলছি। এটাই এ দেশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা। পরিবেশ ওদের এ আশা জাগিয়েছে; তাই 'বিড়াল বলছে– খাবো-না মাছ, ছোঁবো না, আমি কাশীতে যাব।' অসুবিধে হলো, কর্তৃপক্ষ যদি এগুলো বুঝেও না বোঝার ভান করে এবং 'গোলেমালে কেটে যাবে দিন' এই তত্ত্বকথা মনে মনে পোষণ করে, তখন কোয়ালিটি ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তোমাদের মতো ভালো ছাত্রছাত্রীরা তখন ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে পালায়।

–স্যার, অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার জন্য দাবি করছে। আমাদের এখানে কিন্তু একেবারে চুপচাপ।

–এরও কারণ আছে, তোমরা তা জানো। এখানে সেমিস্টার লস হচ্ছে না, আবার বিনা লেখাপড়ায় সুযোগমতো অনলাইন বুদ্ধিতে ভালো গ্রেড পেয়ে সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে তাই। এতে যে নিজেদের ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, সে বুঝ কি ওদের আছে!

–স্যার, পরীক্ষায় কোনো অঙ্ক দেবেন না?

–হ্যাঁ দেবো। বড় অঙ্কগুলোকে ভেঙে ছোট ছোট করে দেবো। আমি তো ক্লাসে ছোট-বড় সব রকম অঙ্কই করিয়েছি। ক্লাসে যেমন অঙ্ক করিয়েছি ও অ্যাসাইনমেন্টের সাহায্যে যেমন শিখিয়েছি, সে-রকমই থাকবে, কিন্তু ফিগারগুলো নিজে তৈরি করে দেবো। এলএমএস-এর মাধ্যমে ক্যামেরার সামনে বসে সমাধান করতে হবে। আমি চাই তোমরা সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করতে শেখো। তোমরা তো জানো, এ বিষয়ে অঙ্কগুলো প্লানিং, ডিসিশন-মেইকিং ও কন্ট্রোলিং

বিষয়সম্পর্কিত, যা শিখলে জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। বাস্তব জীবনে সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বাড়বে। ওরা তা শিখতে চায় না, মুখস্ত করতে চায় অথবা দেখে লিখতে চায়। তা কি হয়! এই অঙ্কগুলো করতে গেলে কিছু থিয়োরি ও টেকনিক জানতে হয়। ধারণার ভিত মজবুত হতে হয়। সেসব না জেনেই ওরা দু-চারটে অঙ্কের সমাধান মুখস্ত করে পাস করতে চায়। পাস করেই চাকরি চায়। তা কীভাবে সম্ভব! খাবারে অনীহ, অরুচি– আবার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো চায়, অবাস্তব মনোভাব। সমীকরণ মেলে না।

–স্যার, ওরা বলে যে, আপনি হোয়াইট বোর্ডে হাতে লিখে অঙ্ক করালে ওরা বুঝতো। আপনি হোয়াইট বোর্ডে অঙ্ক করালেও ওদের তো কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখতে হতো। আপনি তো কম্পিউটার স্ক্রিনে কী-বোর্ডে টাইপ করে অঙ্ক করাচ্ছেন। এতে লেখা পড়তে আমাদের আরো সুবিধা হচ্ছে।

-নিজে না পড়ে অন্যের খুঁত ধরার চেষ্টা আর কি! হাঁটতে না জেনে উঠোনকে বাঁকা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আমরা আবার সেই তালে তাল মিলাচ্ছি। মূলত আমাদের সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ তলানিতে নেমে গেছে। আত্মজিজ্ঞাসা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী?' আমাদের দিন ক্রমশই শেষ হয়ে আসছে। আসলে নীতি-দুর্নীতি না ভেবে সময় বুঝে যারা তাল মিলিয়ে কথা বলতে পারছে, তারাই বর্তমান আসরে কল্কে পাচ্ছে। এটা এক ধরনের সামাজিক অবক্ষয় ও অধঃপতন।

–স্যার, ওরা তো লেখাপড়া ও আপনাদের সম্বন্ধে অনেক বাজে কথা বলে। সেগুলো তো আপনাদের বলতে পারিনে। আপনারাও শুনে কষ্ট পাবেন। কেউ কেউ এগুলো শিক্ষক মূল্যায়নে লেখে। শিক্ষকদের মূল্যায়নের সময় ওরা একজোট হয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নেয়। সেজন্যই দেখবেন ওরা সবাই একই কথা লেখে।

–আমি এগুলো অনেক শুনেছি। ওরাই এ দেশের রত্ন, দেশের ভবিষ্যৎ। ওদের মানসিকতা পরিবর্তনের আমরা কোনো চেষ্টা করিনে, বরং আগুনে ঘি ঢালি। ওদেরকে উসকে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করি। আবার ওদেরকে গড়ার বড় বড় আপ্তবাক্য মুখ দিয়ে আওড়াই, আত্মপ্রবঞ্চনা করি। মূলত আমাদের দেশে শিক্ষার পরিবেশ নেই। ছোটবেলা থেকে ওরা লেখাপড়া করে অভ্যস্ত না। অথচ ওরা টাকার জোরে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। হঠাৎ করে শিক্ষার মনোভাব ফিরে আসবে কী করে! দেশে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা উচিত। শিক্ষা প্রশাসনের উচিত ক্লাসের কতজন ছাত্রছাত্রী একই খারাপ কথা লিখেছে তা ভেবে দেখা। শিক্ষকদের স্তরভিত্তিক মূল্যায়ন করা উচিত। আবার ভালো ও মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীদের সাথে বৈঠক করে প্রশাসন শিক্ষক সম্বন্ধে জানতে পারে। একজন ভালো শিক্ষক যেমন হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যেতে পারে না, আবার একজন খারাপ শিক্ষকও হঠাৎ করে ভালো হতে পারে না। এটা কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিত। এক্ষেত্রে ভালুকের হাতে খন্তা তুলে দিলে যা হয়, তাই হচ্ছে। শিক্ষার্থী অমনোযোগী হলে, শিক্ষকের দেখানো পথ মতো না লেখাপড়া করলে যত ভালো শিক্ষকই হোক শিক্ষাদান কঠিন হয়। আর শিক্ষা দেওয়া তো ঠেলাগাড়ি না যে, শিক্ষক নিজেই একটু ঠেলে দেবেন। আবার যে রোগী ডাক্তারের কথা না মেনে নিজেই প্রেসক্রিপশন করে, নিজের মতো ওষুধ খায়, সে রোগী বেশিদিন টেকে না। এটাও সত্য যে, নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম মানের ছাত্রছাত্রীরা সনদপত্র নেওয়ার পরে সাধারণ কিছু করে জীবন পার করবে। এই বিদ্যা দিয়ে জীবনে বড় কিছু করতে পারবে না, করতে যাবেও না। শুধু প্রতিষ্ঠানের মানকে নীচে নামিয়ে দেবে। তোমাদেরকে অনেকবার আমি বলেছি, শুধু চাকরির জন্য না, নিজেকে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে ভাবতে শেখো। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে, যা আমি এ সাবজেক্ট পড়াতে গিয়ে যতদূর পারি বাস্তব তথ্য উপস্থাপন করে শেখানোর চেষ্টা করি। তোমাদের অনেকেই তা পছন্দ করে না, আমি জানি। তারা শুধু স্লাইডের গোটা গোটা কথা অল্প-দুটো মুখস্ত করে পাস করতে চায়। তা আমি করাতেও পারি কিন্তু সে পথে ইচ্ছে করেই যাইনে। এতে নিজের বিবেকের কাছে হার মানা হয়। ওতে শিক্ষার পরিপূর্ণতা আসে না। তাদের মনমতো চলিনে বলে তারা অন্যভাবে ঘুরিয়ে একটা দোষ আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে পার পেতে চায়। এটা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ওদের কথামতো শিক্ষা দিলে তোমরা যে ক'জন শিখতে এসেছো, তাদেরকে শিক্ষা বঞ্চিত করা হবে, তাদের জীবনের উন্নতিকে শেষ করে দেওয়া হবে। কে ফেল করলো, কে পাস করলো এটা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। আমার বিবেচ্য বিষয়, আমি কতটুকু শেখাতে পারলাম।

যে এ বিষয়গুলো শিখবে, অবশ্যই সে ভালো রেজাল্ট করবে। না পড়লে, না শিখলে আমি নম্বর দেবো কোথা থেকে? কীসের ভিত্তিতে নম্বর দেবো! নম্বর তো আমি দেবো না, তাকে শেখার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। প্রতি ক্লাসেই কয়েকজন তো ভালো গ্রেড পাচ্ছে। বেশ ক'জন মাঝারি মান বজায় রাখছে। নিশ্চয়ই যারা লেখাপড়া করছে, তারা ভালো করছে। আবার কেউ অসদুপায় অবলম্বন করতে চাইলে আমি তা সাধ্যমতো নিয়ন্ত্রণ করবো। এটাই স্বাভাবিক। এটা আমার দায়িত্ব। আমার জেগে ঘুমানো উচিত না। আমি শেখাতে এসেছি। শিক্ষকের কথামতো শিখলে, লেখাপড়া করলে তোমরা ভালো করবে। আমি তো শিক্ষার নামে নম্বর দেওয়ার দানবাক্স খুলতে পারিনে। আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে ছাত্রছাত্রী মূল্যায়নের যথাসম্ভব ভালো পথটাকে বেছে নিয়েছি, যেখানে ওরা ফাঁকি দিয়ে গ্রেড নিতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীদের মনোভাব, জনগোষ্ঠীর বুঝ ও বিবেকবোধে ধস নামতে পারে, এতে আমার কী আসে-যায়! এ পৃথিবীতে এমন কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান তুমি খুঁজে পাবে না, যেটা কোয়ালিটির সাথে আপস করে ব্রান্ডেড প্রতিষ্ঠান হতে পেরেছে। আমি নম্বর নিয়ে দানছত্র খুলে বসলে তোমাদের ঐ সনদপত্রের ভবিষ্যতে কোনো মর্যাদা থাকবে না। এ প্রতিষ্ঠান রসাতলে যাবে। তাতে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ প্রতিষ্ঠানে তখন আর ভালো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে আসবে না। এ বোধ আমাদের অনেকের নেই। তোমরা একটা ছেলে বা মেয়ে খুঁজে বের করো, যে বলবে– সে লেখাপড়া করেছে, অথচ খারাপ গ্রেড পেয়েছে। আমি যে বিষয় পড়াই, তাতে শ্রেণিকক্ষে বসে শেখা আর অনলাইনে বসে শেখার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শেখার মানসিকতার। যেমন শিখবে, তেমন গ্রেড পাবে। আমি শিক্ষক। তোমাদের অমঙ্গল আমি চাইনে। আমি কোনো আত্মপ্রবঞ্চনা করতে পারবো না, কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বও করতে পারবো না। এটা করতে বললে তার আগেই আমি এ পেশা ছেড়ে দেবো। তোমরা যতই ফেসবুকে লেখালেখি করো না কেন, আমি আমার অবস্থানে অবিচল থাকবো। করোনার দোহাই দিয়ে ফাঁকি দেওয়ার ট্রেইনিং নেবে, এটা হবে না। অসুখে আক্রান্ত হবার কারণে তোমাদের কোনো অসুবিধে হলে আমাকে খোলামেলা জানাবে, আমি তা বিবেচনা করবো। আমার চিন্তার স্বচ্ছতা থাকবে কি-না, রুজি-

রোজগার বৈধ হবে কি হবে না– এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার নিজস্ব। নইলে এ দেশের শিক্ষকতা পেশার অকালমৃত্যু হবে। আমরা শিক্ষকেরা এবং অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মরা গাঙের বানভাসি-কর্দমাক্ত প্রবল স্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছি বলেই না এ দেশের শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষামানের এই দুর্গতি। তোমরা যারা ভালো আছো, তোমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তোমরা কোনটা বেছে নেবে। শিক্ষাঙ্গনে নিম্নমানের ছাত্রছাত্রী আগেও ছিল, এখন সংখ্যায় বেশ বেড়েছে, ওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ– এই আর কী! আমরা সামাজিকভাবে যেটা হারিয়েছি, সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ। বর্তমানে 'চোরের মার বড় গলা' হয়েছে– এটাই পার্থক্য। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিনা পড়ায় সনদপত্র নেওয়ার চেষ্টা, এটাকে কোনোমতে সমর্থন করা যায় না। ফেসবুকে লেখার ভয় দেখিয়ে কৌশলে নম্বর আদায়ের চেষ্টা ঠিক না। না শিখলে জীবন-চলার পথে পিছনে পড়বে। আমরা সেটা হতে দিতে পারিনে। তোমাদের বাপ-মা প্রতিষ্ঠানে টাকা দিচ্ছেন। তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। ছেলে-মেয়ে শিখতে চাইলো না, আর আমরা না পড়িয়ে, না শিখিয়ে নম্বর দিয়ে পার করে দিলাম। এ ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা না করাই ভালো।

–স্যার, প্রত্যেক ক্লাসে তো আমরা সংখ্যায় কম। তাই ওরা মনগড়া অনেক কিছুই বলে যায়। আমরা কিছু বলতে পারিনে, অন্য ভয়ও আছে। তাই চুপ থাকি।

–তোমরা জানো, ওরা ক্লাসেও উপস্থিত থাকে না। নেটের মাধ্যমে ক্লাসে ঢুকে কম্পিউটার অন রেখে অন্য কাজে চলে যায়। ক্যামেরা অন করতে বললে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। আমি যখন একটা কথা বুঝিয়ে বার বার জিজ্ঞেস করি, বুঝেছো, বুঝেছো? কোনো উত্তর পাইনে। তখন বুঝি, ওরা কম্পিউটারের সামনে নেই। আমার কথা শোনেনি, কিছুই শেখেনি। আমার মনে হয়, অন-ক্যাম্পাস লেখাপড়া শুরু হলে, পরীক্ষাগুলো অন্তত ক্যাম্পাসে বসিয়ে নিতে পারলে সনদপিয়াসী মতলববাজ ছাত্রছাত্রী নামধারী সুযোগসন্ধানীদের দৌরাত্ম্য অনেকটাই কমে যেত। তোমাদের দিন তখন হয়তো ফিরে আসতো।

–ওরা ক্লাসে ঢুকে কম্পিউটার অন রেখে কেউ ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কেউ ঘুমায়। রাত জাগে তো! আমরা জেনেও কিছু বলতে পারিনে। ওরা আমাদের অনেককে বলে রাখে, রোল-কল শুরু হলে ফোন দিতে।

–একবার কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর পড়া ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে তার পক্ষে লেখাপড়ায় আবার মন বসানো অনেক ক্ষেত্রেই আর সম্ভব হয় না। পরবর্তীকালে ঝরে যায় অথবা বিভিন্ন অজুহাতে অসদুপায়ের পথ খোঁজে। এর মূল কারণ 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' শিখতে ফাঁকি দিলে সন্ধি প্রকরণ, প্রত্যয় ইত্যাদি ভালোভাবে শেখা কখনোই যায় না। ভালো ফলও পাওয়া যায় না। পড়াতেও আর মন বসে না। আবার মানুষ তো ইচ্ছে করলেই অতীতে ফিরে যেতে পারে না। অনেক সমস্যা। এর মধ্যে মনোবিজ্ঞান লুকিয়ে আছে। আমরা করোনার সময়ে তোমাদের সিলেবাসটা কমিয়ে দিয়েছি, সাধ্যমতো শিখিয়ে তোমাদেরকে লেখাপড়ার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু অনৈতিকভাবে নম্বর অর্জনের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হবে। নইলে পুরো প্রজন্মটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা বাহাত্তর সালের গণ-টোকাটুকির পরীক্ষা দেখেছি। ওদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষায় যেতে পারেনি। অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছে। ফাও খাওয়ার অভ্যাস একবার হলে, লেখাপড়ায় আর মন বসে না। তখন জীবন মানের অবনতির বিনিময়ে দায় শোধ করতে হয়।

–আমাদের ক্লাসের কারো কারো পরিবার করোনায় আক্রান্ত, এটাও সত্য।

–তোমাদের ক্লাসের দুজন ছেলেমেয়ের পরিবারে এই সেমিস্টারে করোনার সমস্যা হওয়াতে তাদের অ্যাসাইনমেন্ট, মৌখিক পরীক্ষা ও ফাইনাল পরীক্ষা পরে নেবো বলে জানিয়ে দিয়েছি। অস্বাভাবিক সময় চলছে, তোমাদের পড়ার সুযোগ করে দিতে পারি, অল্প শিখিয়ে পাস করিয়ে দিতে পারি, শিক্ষায় ধরে রাখার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু মিথ্যা অজুহাতে ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারিনে। অনলাইন হওয়ার কারণে আমাকে বেশি সময় দিতে হবে, আবার তোমাদেরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। তোমাদের অনেকেই সুযোগসন্ধানী হবে, অসদুপায় অবলম্বন করবে, এটা আশা করিনে। অন-ক্যাম্পাস হলে এই বিষয় পড়াতে গিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্রুপে গ্রুপে তোমাদেরকে পাঠিয়ে, বাস্তব তথ্য এনে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা করতাম। করোনার কারণে সেটাও বাদ দিয়েছি। এখন এই দুজনের অজুহাত দেখিয়ে তো আর সবাই সব রকমের শেখা থেকে পার পেয়ে যেতে পারে না। আমরা শিক্ষক। আমাদেরও তো শিক্ষা বিষয়ে

একটা দায়িত্ব আছে, মূল্যবোধ আছে। বইয়ের শিক্ষাটাকে বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের বোধগম্য করে দিতে পারি। দুটো ভালো উপদেশ দিয়ে তোমাদের জীবনকে গড়ে তোলার কথা বলতে পারি। এসেছি শেখাতে, বই পড়া থেকে তো আর অব্যাহতি দিতে পারিনে। শেখার চেষ্টা থাকলে এভাবেও অনেক কিছু শেখা সম্ভব। ওরা তো বইয়ে একেবারেই হাত দিতে চায় না। বইটাতে হাত ছোঁয়াবো না, টপিকগুলোর নামটা পর্যন্ত জানবো না, অসদুপায় অবলম্বনের মওকা খুঁজবো, না শিখে ভালো নম্বর নিয়ে পাস করতে চাইবো, শিক্ষকের পড়ানোর ব্যবস্থাপত্র বাতলে দেবো– এ আবার কেমন অলীক ও বিকৃত মনোভাব? এর পরিণতি মারাত্মক হবে। তোমরা একবার ভুল পথে নম্বর অর্জনে অভ্যস্ত হলে কোনোদিনই আর সঠিক পথে ফিরে আসতে পারবে না। শেখায় মন বসবে না। তোমাদের ভবিষ্যৎ-শিক্ষার যবনিকাপাত হবে। এটা নিশ্চয়ই তোমরা চাও না।

কথোপকথনের মধ্যে এফ রহমান ভাবছেন, আমি তো দিনে দিনে ক্রমশই অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকার শীর্ষস্থানে চলে যাচ্ছি। একসময় আমার সাথে ক্লাস করার জন্য অন্য সেকশনের ছাত্রছাত্রীরাও অনুমতি নিয়ে ক্লাসে এসে বসে থাকতো। সে দিন যে কোথায় গেল! শিক্ষা-প্রশাসন ও ছাত্রছাত্রী উভয়ের কাছেই অযোগ্য শিক্ষক হয়ে যাচ্ছি। ট্যাক্টফুল নই, বাতাস বুঝে থুথু ফেলতে জানিনে বলে বাজারে দুর্নাম রটছে। কোনো কোনো শিক্ষা-প্রশাসন আমেরিকা থেকে পাস করা শিক্ষক খুঁজে ফিরছে। সে-সব কথা বিজ্ঞাপনে লিখে শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করছে। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জন ও শেখার তৃষ্ণা তো কেউ জাগানোর চেষ্টা করছে না! শেখার লোকের নিদারুণ আকাল, আবার নতুন নতুন শিক্ষাতত্ত্ব শেখানোর জন্য শিক্ষক ট্রেইনিংয়ের সাড়ম্বর সমারোহ। লেখাপড়া অনেক প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে। উঠে গেছে। চলছে সনদপত্র কেনাবেচার স্বরগ্রাম। 'আমি পড়তে যাচ্ছি, আমি পড়াতে যাচ্ছি'– কথাগুলো বলার রেওয়াজ আমাদের সমাজ থেকে বাদ দিলে হয়। ছাত্রছাত্রী বলবে– আমি শিখতে যাচ্ছি। শিক্ষক বলবেন– আমি শেখাতে যাচ্ছি। এতে একটা মানসিক পরিবর্তন আসতে পারে। এ নিয়ে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ট্রেইনিং সেশনের আয়োজন করা যেতে পারে। সেগুলো কি আমরা করছি? ছাত্রছাত্রী চারজন কথা বলে উঠলো–

–স্যার, আমরা তো জানি আপনি ভালো পড়ান, ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব জ্ঞান দিয়ে

অনেক কিছু শেখাতে চেষ্টা করেন। দীর্ঘদিন আপনার নাম শুনে আসছি। ওরা না শিখতে চাইলে আপনি ওদের কীভাবে শেখাবেন! আপনি কষ্ট পাবেন না স্যার। আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা নিজেদের মধ্যে, কখনো বাড়িতে আপনার কথা আলোচনা করি।

–কিন্তু তোমার-আমার মতো লোকের সংখ্যা এ দেশে ক্রমশই কমে যাচ্ছে। শুধু সাথে থাকলেই হবে না। তোমাদের, সংখ্যায় যত কমই হও না কেন, প্রতিবাদী হতে হবে। শেখার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। নইলে নিঃশেষ হয়ে যাবে। চলো, আমরা জোট বাঁধি, জীবন গড়ি। আরো একটা কথা বলি। তোমরা জানো না, আমার নাম শুধু ফটিক। অজপাড়াগাঁয়ের এক অখ্যাত পরিবারের ধুলোমাটিমাখা অযত্নে লালিত-পালিত ছেলে 'ফটিক'। আমার লেখাপড়া হবে এটা কেউ কোনোদিন ভাবেনি, কল্পনাতেও আনেনি। কাঁচি-মাথাল আমার সম্বল হবার কথা ছিল। ক্লাস নাইনে ওঠার পর স্কুলের হেডমাস্টার আমার নামের শেষে 'উর রহমান' জুড়ে দেন। নাম হয় ফটিকুর রহমান। গ্রামে আমাদের হারিকেন ও বই ছিল রাতের সম্বল। তোমাদের এই পর্যায়ের লেখাপড়ায় প্রতিটা বিষয়ে কমপক্ষে ছয়-সাতজন লেখকের লেখা বই পুরোটা তন্নতন্ন করে তখন পড়তে হতো, পড়া নিয়ে ভাবতে হতো, বাস্তবের সাথে পড়াগুলো মেলাতে হতো। কিছু শিখেছিলাম বলেই তোমাদের তা বিতরণ করে এই পেশাতে এতটা বছর টিকে আছি। দেখেছি, লেখাপড়ার প্রতি যদি ভক্তি ও ধ্যান না থাকে, ইচ্ছে না থাকে, তবে তা কোনোদিনই অর্জন করা যায় না। টাকা দিয়ে সনদপত্র পাওয়া যায়, লেখাপড়া পাওয়া যায় না। জোর করে লেখাপড়া শেখানোও যায় না। যার আগ্রহ ও লেখাপড়ার জন্য ত্যাগ আছে, কেবল তারই লেখাপড়া হয়। আমরা শুধু বইটা তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, ভালো দুটো উপদেশ দিতে পারি মাত্র। জানতে হলে পড়তে হবে, ভাবতে হবে, শিখতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

(পল্লবী, ঢাকা: ২১.০৬.২০২১)

শান্তির আশ্রয় ও এক জালাল উদ্দিন

জালাল উদ্দিন তার স্ত্রীর পাশে বসে একদিন কথা পাড়লো। অল্প হাসি দিয়ে বললো– তোমাদের জন্য আমি আবার একটা উদ্যোগে হাত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। তোমার অনুমোদনের অপেক্ষায় আছি। তুমি তো জানো, তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কোনো কাজে হাত দিইনে। এটা আমাদের পরিবারের জন্য লাভজনক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি কোনো কাজে হাত দিয়ে সফলকাম হতে পারিনি– এমন ঘটনা বিরল। এবারও লাভবান হবো জানি। আমার এ কপালটাই লাভের কপাল। তোমাকে পেয়ে আমি খুব সুখ-কপালে হয়েছি।

–হ্যাঁ, তুমি যেখানেই যাও জিতে যাও, এটা সত্য। কিন্তু তোমার আসল উদ্দেশ্য কোনোভাবে কোনো অভাজনের কাছে ফুটে উঠলেই তোমার সাথে মনোমালিন্য শুরু হয়। তুমি তখন তোমার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নাছোড়বান্দা। গ্রুপিংয়ে জড়িয়ে যাও। তোমার ঐ হাসি দিয়ে কারো কারো মন জয় করো। দরকারমতো আক্রমণাত্মক কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করো না। কারো উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা করো। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠো। কখনো শেষে পরিত্যক্ত হয়ে বিদায় নাও। কখনো গ্রুপিং করেই টিকে থাকো বটে কিন্তু তোমার স্বার্থপরতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অন্য কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, এই দীর্ঘ বছরে তোমার সাথে চলতে গিয়ে আমি তোমাকে চিনেছি। তোমার সাথে তর্ক আমি যতই করি, তোমাকে আমি ভালো জানি। কারণ প্রতিটা মেয়ে সংসারজীবনে বৈষয়িক। বৈষয়িক স্বামী তাদের পছন্দ। তোমার এই বর্ণচোরা জীবনে তুমি সফলকাম হয়েছো, এটা আমার সৌভাগ্য। তুমি এগিয়ে যাও, আমি তোমার সাথে আছি।

সায়মা আক্তার লম্বা-চওড়া একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলো।

–তুমি আমাকে এভাবে খোঁটা দিয়ে কথা বলছো কেন? আমি যা কিছুই করি, তোমাদের জন্যই তো করি।

জালাল উদ্দিন হেসে সায়মার দিকে তাকালো। আরো বললো– তুমি তো জানো, আমি কোনো অবৈধ কাজ করিনে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, দাড়ি রেখেছি, ফরাজি বংশের ছেলে।

–বৈধ-অবৈধ বিবেকের বিচার। এমনও তো হতে পারে, তোমার মনে যেটা বৈধ, প্রকৃতপক্ষে সেটা অবৈধ।

–লেখাপড়া জানা বউয়ের সাথে তর্কে পেরে ওঠা শক্ত। যাক, ওসব কথা এখন থাক।

জালাল উদ্দিন হার মানলো। দেখলো, এখন তর্কে নামলে আসল কথা বলা হবে না। নইলে সে হার মানার লোক না। সে জানে, তার অনেক অনৈতিক কাজের রাজসাক্ষী তার বউ। তাকে বোঝানো অত সহজ না।

সায়মা স্বামীর ঘরে দীর্ঘদিন সংসার করছে। স্বামীর অতিবুদ্ধি ও বৈষয়িক মনোভাবের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। সে জানে, জালাল উদ্দিন মানুষ পটানোতে ওস্তাদ, অল্প অল্প করে কথা বলতে বলতে আসল কথায় আসে। হেসে হেসে কথা বলে। বড় মেধাবী ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ জালাল উদ্দিন। তবে স্বার্থের ব্যাপারে সে অবিচল। স্বার্থ উদ্ধারে পটু। এ বিষয়ে কারো সাথে কোনো আপস নেই, উদারতা নেই। যুক্তি দেখিয়ে কাউকে বুঝিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে সে বিশেষভাবে পারঙ্গম। অন্যের কথা ভাবে না, নিজেরটাই শুধু সে দেখে। প্রথমত হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে আন্তরিকতা দেখিয়ে লাভবান হতে চেষ্টা করে। এতেও লাভ না হলে কীভাবে আঙুল বাঁকা করে ঘি উঠাতে হয়, চোখ উল্টাতে হয়– তা সে জানে। এ নিয়ে সায়মার সাথে অনেক সময় কথা কাটাকাটিও হয়। যুক্তি-তর্কে জালাল উদ্দিন বরাবরই জিতে যায়। সে ভিতরের উদ্দেশ্যটা কাউকে না বলে চেপে রাখতে জানে।

–তা কী কাজে হাত দিতে যাচ্ছো বলো?

–কয়েকজন সহকর্মী ও পরিচিতজন পেয়েছি। আরো দু-একজন পেয়ে যাবো। সবাই মিলে আবার একটা জমি কিনে আমার নেতৃত্বে একটা বিল্ডিং তৈরি করবো। আমার দায়িত্বে কাজ হবে। আমাদের বাসার কাছেই। নিজের হাতের লোক কাজে লাগাবো। ওরাই সবকিছু করবে। আমি বাসায় যাওয়া-আসার পথে একবার ঢুঁ মেরে এলেই কাজ হয়ে যাবে। আমার হাতে গড়া কিছু লোক আছে না? ওরাই সব করে দেবে। কেনাকাটা আমার লোক করবে। আমি প্রস্তাব দেবো, দেখাশোনা বাবদ

আমি দশ পার্সেন্ট টাকা কম দেবো। ফ্ল্যাটটা সিলেক্ট করবো কম রেটের, সুবিধা নেবো বেশি। তুমি তো জানো, ধর্মে ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল করেছে। ধরে নাও এটাও আমার একটা ব্যবসা। এতে আরো কিছু লাভ হলে খারাপ তো কিছু দেখিনে। আমি বিভিন্নভাবে হিসেব কষে দেখেছি। নামমাত্র খরচে দুটো ফ্ল্যাট আমাদের নামে হবে। আমি বিল্ডিং তৈরি, জমি কেনা– এসব বিষয় ভালো বুঝি। এগুলো তো টেকনিক্যাল জ্ঞান। আমি আমার এ টেকনিক্যাল জ্ঞান ব্যবহার করে লাভবান হতেই পারি, এতে তো দোষের কিছু দেখিনে।

জালাল উদ্দিন খুব দৃঢ়তার সাথে হাসিমুখে কথা বলে গেল।

–মানুষ লাভের জন্য ব্যবসা করে– এ কথা খরিদ্দারও বোঝে। তুমি কি নতুন সহকর্মীদের কাছে এসব কথা বলেছো যে, জমি ও অন্যান্য সব কেনাকাটায় তোমার ব্যবসা থাকবে? নামমাত্র টাকায় তুমি ফ্ল্যাটজোড়া পেয়ে যাবে?

–এটা বলার প্রয়োজন পড়ে না। ওদের এটা বোঝা উচিত। আমি পরিশ্রম করবো, অভিজ্ঞতা ও মেধা খাটাবো– আমার পারিশ্রমিক থাকবে না, তা কি হয়? এটা অব্যক্ত ধারণা। বুঝে নিলেই হয়। বাড়ির কাছের কাজ, এলাকার বড় চাঁদাবাজ-মাস্তান আমার ঘনিষ্ঠ। অন্য লোকের কাজ হলে সে দশ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করতো। সহকর্মীদের কাছ থেকে এ বিষয় বাবদ পাঁচ লাখ টাকা আমার লাভ হলে, আমি খারাপ তো কিছু দেখিনে! আমি না থাকলে ওদের তো এই দশ লাখ দিয়েই কাজ করতে হতো। আমার এ সহকর্মীরা কনস্ট্রাকশনের কাজ তেমন একটা বোঝে না। বাড়তি খরচ কিছু কমিয়ে আমি লাভবান হলে তাতে ওদের তো কোনো ক্ষতি নেই। ওরা দু-তিন বছর এখানে এসে একটু দেখাশোনা করবে, নিয়মিত টাকাটা দেবে, সময় শেষে ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে। এতে ওদেরও লাভ। ডিভেলপারদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনতে গেলে কতভাবে ঠকাতো! টাকা মার যাবার ভয় থাকতো। এখানে তো টাকা মার যাবার ভয় নেই। এটা কি তাদের লাভ না? ডিভেলপারদের লাভ দিতে পারলে আমাকে লাভ দিতে আপত্তি থাকবে কেন? লাভ বাবদ মাত্র দুটো ফ্ল্যাট। এখানে বরং রিস্ক অনেক কম। আর বিনা ঝঞ্ঝাটে ঢাকা শহরে দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর ধারে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই কে না চায়!

–হ্যাঁ, তোমারও লাভ, তাদেরও লাভ। করতে পারলে ভালো। তুমি কি বুঝে দেখেছো এই ক'টা ফ্ল্যাটের উপরে তুমি দুটো ফ্ল্যাট ফ্রি করে নিতে চাচ্ছো, তোমার জন্য তাদের ফ্ল্যাট প্রতি কত টাকা বেশি পড়বে? আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমি জানি তুমি এগুলো ভালোই পারবে। তবে তুমি যে এখান থেকে লাভবান হতে চাও– তাদেরকে কথাটা বলে নিলে অসুবিধে কী? তুমি যে অন্য আরো কয়েক জায়গায় এসব আশাজাগানিয়া জমি-দালানের দালালি ব্যবসা করে ভালো লাভ করেছো, কোথাও কোথাও ধরাও খেয়েছো– এ কথা কি তোমার সহকর্মীরা জানে? তোমার যে আর্থিক দুর্নীতির জন্য অফিস থেকে চাকরি চলে গেছে, তোমার এ নতুন সহকর্মীদের কি তা বলেছো?

–না, এখনো বলিনি। গুছিয়ে-গাছিয়ে সময়মতো একটু একটু করে কিছুটা বলবো, ভাবছি। এ দেশে আবার নীতি-দুর্নীতি বলতে কিছু আছে নাকি! এ বিষয়ে অফিস তো আমার উপর সম্পূর্ণ অবিচার করেছে, জানো। এই অবিচারের বিচার আমি করিয়েই ছাড়বো। আমি লেবার কোর্টে কেস দিয়েছি। বড় ধুরন্ধর আইনজীবী ধরেছি। তার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে। আইনজীবী আমাকে কথা দিয়েছেন, মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে পারলে কেসে জিতে লাভে-আসলে অনেক টাকা ফেরত পাবো। তাকে লাভের একটা অংশও দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের আইনজীবীকে উনি ম্যানেজ করবেন। অন্য দিকও উনি নিজে ম্যানেজ করবেন। এটাও আমার জীবনের একটা সুযোগ। অফিসে না গিয়েও বাড়ি বসে সব বেতন পাবো। মামলা চলাকালীন বসে না থেকে জমি-দালানের মধ্যস্থতা করে উপায়ের পথ ধরেছি– এ উপার্জনটুকুও আমার লাভ। এ ব্যবসা তো আমি চাকরিতে থাকতেও করেছি।

–তুমি টাকা খরচ করতে পারলে এ দেশে সবকিছুই করিয়ে নিতে পারবে। তা আমিও জানি। এ দেশে টাকার পরশে যে কোনো অবৈধ কাজও বৈধ হয়ে যায়; সমস্ত লোহা, কয়লা সোনা হয়ে যায়। অন্যায় ন্যায় হয়ে যায়। এ এক আজব দেশ। এভাবে সরকারি টাকায় পকেট ভরা কতটা বৈধ, এটাও হিসাব করে দেখো। আর তোমার এ জমি-দালানের মধ্যস্থতার ব্যবসাকে আমাদের সমাজে দালালি ব্যবসা বলে, যেটা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে।

–বৈধ-অবৈধ অত দেখতে গেলে এ দেশে বাস করা চলে না। মানুষ কতই-না নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করে টাকা উপায় করছে! সহকর্মীদের কাছ থেকে তো আর টাকা উপার্জন করতে চাচ্ছিনে। মেধা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে মাত্র দুটো ফ্ল্যাট অল্প টাকায় করিয়ে নিতে চাচ্ছি। এতে আমি দোষের কিছু দেখিনে। এ টাকা তাদের পকেট থেকেও যাবে না, মাছের তেলে মাছ ভেজে খেতে চাচ্ছি। এতে তো তাদেরই লাভ। ডিভেলপারের কাছ থেকে কিনতে হলে তাদের আরো অনেক টাকা খরচ হতো।

–এর আগেও তুমি অনেককে নিয়ে প্রজেক্টের নামে জমি কেনাবেচার দালালদের সাথে থেকে মধ্যস্থতা করে ও নির্মাণকাজ করে বেশ ভালো লাভ করেছো। শহরতলীতে বাগানবাড়ি করেছো। তোমার প্রজেক্ট করার টেকনিকটা ভালো, এতে অভিনবত্ব আছে। কিন্তু এ ব্যবসাটা অনেকেই ভালো চোখে দেখে না। তোমার এ লুকোচুরির ব্যবসা পরে ধরা পড়ে যায়।

–লাভ না থাকলে আমি কোনো কাজ করিনে। আমার পারিশ্রমিক আছে না? আমার মনে মনে একটা হিসাব সব সময়ই থাকে। আমি অর্থশাস্ত্রে লেখাপড়া করেছি, হিসাব বিভাগে চাকরি করেছি। বেহিসেবি কাজ তো আমাকে দিয়ে হবে না। জমিজমা ও বিল্ডিংয়ের কাজে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম বলেই তা ব্যবহার করে মানুষকে বোঝাতে পারছি। অভিজ্ঞতারও মূল্য আছে। অভিজ্ঞতা দিয়ে লাভের তরিকা ধরেছি। ঢাকা শহরে এই অভিজ্ঞতাই আমার সম্পদ।

–তুমি এ ব্যবসার সাথে বীমা কোম্পানির পলিসি বিক্রির দালালি করলে জীবনে আরো ভালো করতে। তুমি মানুষকে পটাতে ওস্তাদ। তোমার সাথে কথায় পারা কষ্টকর।

–আমাকে এই সকাল বেলায় রাগিয়ে তোমার কী লাভ বলো? তোমাদের জন্যই না আমার এতো ভাবনা, এতো কিছু করা।

পরদিন জালাল উদ্দিন নতুন অফিসে এসে সহকর্মীদের সাথে নিয়ে মিটিং করলো। বললো– এলাকায় জমির দাম বাড়তির দিকে। আপনারা জমি একবার কিনতে চেয়ে বায়না দিতে দেরি করেছেন। সেজন্য বিক্রেতা একটু বেশি দাম হাঁকছে। দেরি করলে দাম আরো বেড়ে যাবে। যা করবেন, তাড়াতাড়ি করে ফেলুন। জমিওয়ালা আমার পরিচিত। মোট টাকা দেওয়ার সময় কিছু কম দেওয়া যায় কি-না বলে দেখবো। সে ভালো মনের মানুষ। আমার কথায় হয়তো কম নেবে। এখন

যা চাচ্ছে দিয়ে দেন। টাকা না দিয়ে আগেই কম দিতে চাইলে খারাপ হবে। আগে বায়নাটা দিই।

সহকর্মীরা জালাল উদ্দিনের আন্তরিকতায় খুশি হলো। কয়েক দিনের মধ্যে জমির বায়না হয়ে গেল। জালাল উদ্দিন নিজে সাথে থেকে দুজন সহকর্মীর হাত দিয়ে টাকা দেওয়ালো। বললো– আমি ছাক্কা লোক। টাকা লেনদেনে আমি কোনো নয়ছয় বুঝিনে। তাই আপনাদের হাত দিয়েই টাকাটা দেওয়ালাম। দুই মাস পর রেজিস্ট্রি হবে। এখন আরো পাঁচজন পার্টনার তাড়াতাড়ি খোঁজেন আর টাকা জোগাড়ে লেগে যান। সুযোগ সব সময় হাতে আসে না। আপনারা ঘনিষ্ঠ হওয়ায় এ এলাকায় আপনাদেরকে আনতে চাই। আমার হাত শূন্য। আমার বিভিন্ন জায়গায় ফ্ল্যাট আছে। এখানকার প্রজেক্টে না থাকলেও চলবে। হাতে টাকা থাকলে হয়তো দুটো ফ্ল্যাট নেওয়া যেত। আমি আগের অফিসে একটু অসুবিধার মধ্যে আছি। এক বছরের মধ্যে হয়তো অনেক টাকা একবারে হাতে আসবে। প্রয়োজনে আপনাদেরকেও সহায়তা করতে পারবো।

কেউ কেউ বললেন– ঠিক আছে, আপনাকে আমরা রাখতে চাই। এখন জমির অংশের দামটা অন্তত জোগাড় করে দিন। নির্মাণ খরচের সময় না-হয় টাকাটা কিছুদিন পরে দিলেন। আমরা ততদিন চালিয়ে নিতে পারবো।

–আমার নেওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। সব আয়োজন আপনাদের জন্য। আপনাদের সাথে থাকতে আমারও মনটা চায়। আপনারা বেশি অনুরোধ করলে আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলে দেখতে পারি। হয়তো ফ্ল্যাট নিতে রাজি হবে না। তবে আপনারা নাছোড়বান্দা হলে দুটো ফ্ল্যাট আমি রাখবো। সায়মাকে পরে আস্তে আস্তে জানাবো।

জালাল উদ্দিন এ কথা বলে হো হো করে হেসে সদ্য-পাওয়া সহকর্মীদের আসর জমিয়ে তুললো।

ঐ বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হলো, প্রতি তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট হবে। মোট আঠারোটা ফ্লাট হবে। নীচতলা ও বেজমেন্টে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকবে। দোতলা ও উপরতলায় যিনি নেবেন, কিছু টাকা কম দেবেন। কমন খরচ সবাই সমানভাবে

বহন করবেন। দোতলা ও উপরতলার মালিক কত কম দেবেন, সেটা ভেবে দেখে আগামীকাল জালাল উদ্দিন জানাবে।

পরদিন আবার সবাই বসলেন। জালাল উদ্দিনের প্রস্তাবে সবাই রাজি হলেন– যিনি উপরতলায় নেবেন ফ্ল্যাট তৈরি খরচের ১৫ শতাংশ এবং দোতলার মালিক ২০ শতাংশ কম দেবেন। ৬ তলার উপরের অন্যান্য তলার মালিকরাও কিছু কিছু টাকা কম দেবেন। বিল্ডিং করার কয়েক বছরের মধ্যে মাঝে-মাঝেই লিফট বিকল হয়ে পড়ে থাকে। যাদের উপরে উঠতে একটু কষ্ট হবে, তারা তো এখন টাকা কিছু কম দেবেই। জালাল উদ্দিন বললো– যে আটজন ১০০ শতাংশ তৈরির খরচ দিচ্ছে তারা নীচতলার গ্যারেজ পাবে। অন্যরা বেজমেন্টে গ্যারেজ পাবে। সবাই সম্মত হলেন।

বাড়িতে বাড়িতে ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেল। সুপ্ত আশা জেগে উঠলো। এত সুখের স্বপ্ন! শান্তির আশ্রয়! জালাল উদ্দিন খুব মিশুক লোক, হরিহর-আত্মা। এমন লোক এ দেশে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কত সাধনায় এমনতর ভাগ্য মেলে! তার বদৌলতে জমি কেনা ও নির্মাণকাজে অনভিজ্ঞ কতিপয় চাকরে যদি ঢাকায় ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারে, মন্দ কী! সোনায় সোহাগা। যৌথভাবে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই তো হবে! বাড়ির একটা আকর্ষণীয় নাম রাখার আয়োজন চলতে থাকলো।

জমি রেজিস্ট্রির দিন পড়লো। আরো তিনজন পার্টনার পাওয়া গেছে। টাকা সব জোগাড় হলো। টাকাটা একত্র করার সময় জালাল উদ্দিন বললো– আমি আপনাদের হাতে টাকা দিতে পারছিনে। আমি টাকা জোগাড় করতে পারিনি। বলেছিলাম না, আমার টাকার সমস্যা আছে! জমির মালিক আমার পরিচিত। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলে যদি আমার টাকাটা তিন-চার মাস পরে দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারি, আপনাদের তো কোনো আপত্তি থাকার কথা না। এ ঝামেলার মধ্যে ভবিষ্যতে আপনাদের জড়াবো না। আপনাদের নামে জমি রেজিস্ট্রি হলেই তো হলো। আমি ওটা নিজে ম্যানেজ করবো। জমির মালিকের কাছে আমার সেটুকু বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। তার হাতে আমি আমার অংশের টাকা সরাসরি দিয়ে আসবো। এ নিয়ে আপনাদের ভাবনার কোনো কারণ নেই।

মালিককে জমির দাম কাঠাপ্রতি কম দেওয়ার কথা উঠলে বললো– আমি তাকে বলেছি। বাজারে জমির দাম বাড়তি। শুধু আমার কথার কারণে জমিটা আপনাদের দিচ্ছে। মালিক তো জমি বেচা-কেনার ব্যবসা করে। তার হাতে অনেক খরিদ্দার সব সময় থাকে। একবার বায়না হয়ে গেলে ওরা আর টাকা কমাতে চায় না। তবু আপনারা যেহেতু বলছেন, আমি আবার বলে দেখতে পারি। কমাবে না মনে হয়। এ নিয়ে কথা বাড়াতে আমার আর ইচ্ছে নেই, মান-সম্মানের ব্যাপার।

জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। সবাই খুব আনন্দিত। বিল্ডিং প্ল্যানের চেষ্টা চলছে। জালাল উদ্দিন এক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের কথা বললো। সাত লাখ টাকা ফি নেবে বলে জানালো। তেঁতুল মুন্সি এতক্ষণ সবার কথা শুনছিলেন। বললেন– আমার পরিচিত একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ার আছেন, নীতিবান মানুষ। তাঁকে আমি অনুরোধ করলে অল্প টাকায় কাজটা করে দেবেন। এ ব্যাপারে আরো কারো কোনো পরিচিত লোক আছে কি-না জানতে চাওয়া হলো। সিদ্ধান্ত হলো তেঁতুল মুন্সির পরিচিতজন দিয়েই ড্রয়িংটা করানো হবে। জালাল উদ্দিন বিষয়টাকে কীভাবে নিলো বোঝা গেল না। তবে ড্রয়িং যতভাবেই করা হোক না কেন, বেশি বেশি ভুল ধরতে থাকলো। রকমারি ফরমায়েশ বাতলাতে থাকলো। একসাথে বসলেই প্রতিবার হরেক রকম পরিবর্তনের কথা বলে। তেঁতুল মুন্সির মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিকটতম আরো কয়েকজনকে নিয়ে এ-কাজে নেমেছেন। জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। পিছিয়ে আসার কোনো পথ নেই। তেঁতুল মুন্সির মতে, কথা একবার দিলে তা যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

তেঁতুল মুন্সি সমাজের অনেক কিছুকেই ভালো চোখে দেখেন না। বর্তমান সমাজের অযোগ্য লোক। নীতিকথা নিয়ে বসে থাকেন। একটু খাপছাড়া স্বভাবের। কথা বলতে গেলে সামনের দুটো দাঁত একটু বেশি বেরিয়ে যায়। দেখতে বেখাপ্পা লাগে। খারাপ কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না। বর্তমান চাপাবাজি সমাজকে মেনে নিতে পারেন না। ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। মিথ্যা এড়িয়ে চলেন, মতলববাজদের ঘৃণার চোখে দেখেন। এ সমাজে জন্ম না নিলেই হয়তো ভালো হতো, এমন একটা ভাব। আজন্ম ভাগ্যবিড়ম্বিত, কপালপোড়া। ভবঘুরে স্বভাবের জীবন। কথা অল্প বলেন। দু-নম্বরি বোঝেন না। সমাজের নৈতিক অধঃপতন সহজে মেনে নিতে পারেন না। চেহারাটাও আকর্ষণীয় না। কথাবার্তা সুন্দর করে

সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারেন না, আবার কখনো সোজাসুজি উচিত কথা বলে দেন। কাটখোট্টা স্বভাবের লোক। জোরে হেসে কথা বলতে পারেন না। কথা বলে আসরও মাত করতে পারেন না। অন্তর্মুখী স্বভাবের। তবে তিনি যা করেন, আন্তরিকতার সাথে করেন। আসল নাম তেলারাম মুন্সি হলেও অম্ল-স্বাদের কথা বলেন বলে নাম হয়েছে তেঁতুল মুন্সি। এ নামে সবাই তাকে চেনে।

অনেক ঘষামাজার পর ড্রয়িং চূড়ান্ত করা হলো। কিন্তু জালাল উদ্দিনের নতুন নতুন ফরমায়েশ চলতে থাকলো। এক মিটিংয়ে জালাল উদ্দিন বললো– আমার বাড়ির পাশে কাজ হচ্ছে। আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে। আমি দেখাশোনার কাজটা করে দেবো। মোট খরচের শতকরা আট ভাগ আমার পারিশ্রমিক দিতে হবে। আমি এ আটভাগ টাকা কম দেবো। আরেকজনকেও সাথে নেবো। সেও আট ভাগ টাকা কম দেবে। এটা এতজন লোকের কাছে তেমন কিছু না।

তেঁতুল মুন্সি বললেন– টেকনিক্যাল বিষয় দেখার জন্য ইঞ্জিনিয়ার আছে। সাধারণ বিষয়গুলো দেখার জন্য আমরা সবাই আছি। যার যখন সময় হবে আমরা দেখবো। আবার আলাদা দেখাদেখির কী আছে! সবাই একসাথে মিলেমিশে কাজ করবো।

এ কথা শুনে সবাই চুপ করে গেল। জালাল উদ্দিন সুবিধা করতে পারলো না। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলো, প্রকাশ করলো না। ফ্ল্যাট বণ্টনের সময় জালাল উদ্দিন বললো– আমার ফ্ল্যাট অতটা দরকার নেই। থাকার ব্যবস্থা পাশেই আছে। হাতে টাকাও নেই। আমি উপর তলায় কম টাকায় নেবো। পরে প্রয়োজনে বেচেও দিতে পারি।

নকশার ভিত্তিতে ফ্ল্যাট বণ্টন হলো। অন্য সবাই যার যার পছন্দমতো ফ্ল্যাটের তলা বেছে নিলেন। জালাল উদ্দিন ১৫% কমে উপরের তলা নিলো। তেঁতুল মুন্সি বললেন– সবার নেওয়া শেষে অবশিষ্টটা আমি নেবো। ফ্ল্যাট বণ্টননামা-দলিল তৈরি করার প্রসঙ্গ এলো। সেখানে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ও উল্লেখ থাকার কথা আলোচনা হলো। তেঁতুল মুন্সি বণ্টননামা দলিলের একটা ড্রাফট এক জায়গা থেকে এনে সবাইকে দিলেন, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এখনই রেজিস্ট্রি করার জন্য। একজন পার্টনার টাইপের কাজটা করে দিলো। জালাল উদ্দিন বললো– এখন রেজিস্ট্রি না করলেও চলে, পরে এক সময় করে নিলেই হবে। আমরা নিজেরাই তো! পরে করলেও কোনো অসুবিধে নেই।

ভবিষ্যৎ অসুবিধার কথা ভাবলেও তেঁতুল মুন্সি এ ব্যাপারে আর কোনো জোর খাটাতে পারলেন না। শুধু বললেন– আমি এর আগেও দু-জায়গায় এভাবে যৌথ উদ্যোগে ফ্ল্যাট তৈরি করতে গিয়েছিলাম। অনেকেই কথা দিয়ে পরে কথা ঘুরিয়ে ফেলে বলে লোকসান দিয়ে ফিরে চলে এসেছি। এ দেশের মানুষের কথা ও কাজে মিল কমে যাচ্ছে। সমাজ টাউট-বাটপারে ভরে যাচ্ছে। অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বার্থ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দেওয়ায় এবং অনৈতিক চিন্তাধারার কারণে যৌথভাবে কোনো কাজ করার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাগের মার গঙ্গা পেতে অসুবিধে হচ্ছে। মোনাফেক, দায়িত্বহীন ও বর্ণচোরা লোকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। পরে গোলোযোগ হয়। এখানেও আমার সে ভয়টা রয়ে গেছে। সব আলোচনা, পরিকল্পনা ও বাধ্যবাধকতার চুক্তি আগে আগে খাতাকলমে হওয়াটাই ভালো। এতে পরে সম্পর্কটা অন্তত ভালো থাকে।

তবু সবাই জালাল উদ্দিনের অনীহার কারণে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ থাকলো।

তেঁতুল মুন্সির পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে কাজ করাতে হচ্ছে বলে তার উপর দায়িত্বটা একটু বেশি পড়ে গেল। এছাড়া তার বয়স অন্যদের তুলনায় বেশি, তাই পার্টনারদের অনেকেই তার উপর নির্ভর করতে লাগলো। এমনিতেও তিনি কর্মপাগল মানুষ। তিনি তা আন্তরিকভাবে মেনে নিলেন। সহকর্মী ও পরিচিতজনদের ফ্ল্যাটগুলো নিজের একটু পরিশ্রম দিয়ে সবাই মিলে করে নিতে পারলে একটা মানসিক শান্তিও আছে। শেষ বয়সটা সহকর্মীদের নিয়ে একসাথে আনন্দ-উল্লাসে এক ছাদের তলায় কাটিয়ে দেওয়া যাবে, এটাই তাঁর আশা।

জালাল উদ্দিন পাইলিংয়ের কাজের জন্য মিস্ত্রি ঠিক করলো। অনেকে মুন্সিকেও বললেন। প্রতি ফুট ত্রিশ টাকা কম রেটে মুন্সি একজন পাইলিংয়ের মিস্ত্রি জোগাড় করে ফেললেন। পাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। জালাল উদ্দিন কাজটাকে ভালোভাবে নিলো না, চুপ করে গেল।

পাইলিংয়ের কাজ শেষ হলো। মিটিংয়ে বসলে সবাই দ্রুত কাজ শেষ করার কথা বলেন। কখনো কেউ কেউ টাকার কিস্তি দিতে দেরি করেন। মিস্ত্রিদের কেউ কিংবা কেয়ারটেকার জালাল উদ্দিনের কাছে টাকা চাইলে তিনি পানি থেকে উঠে

পাতিহাঁসের গা-ঝাড়া দেওয়ার মতো গা ঝাড়া দিয়ে দায়িত্বটা নিজের কাঁধ থেকে ফেলে দেয়। বলে– আমি কারো কাছে টাকা চাইতে পারবো না। তেঁতুল মুন্সির কাছে টাকা চাইতে বলেন। জালাল উদ্দিন কোনো কাজ গায়ে মাখে না।

জালাল উদ্দিনসহ আরো দুজনের নামে যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলা হলো। জালাল উদ্দিন যৌথ হিসাবেও কাউকে টাকা জমা দিতে বলে, আবার উঠানোর সুবিধার কথা বলে নিজের ব্যাংক হিসাবেও কোনো কোনো টাকা জমা রাখে। হিসাবপত্র ঠিকমতো রাখা হয় না। তালগোল পাকিয়ে যায়। জালাল উদ্দিন যৌথ হিসাব ও নিজের ব্যাংক হিসাব আলাদা রাখতে পারে না। হিসাব নিয়ে বসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। হিসাবের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে না। যৌথ টাকাও নিজের টাকার সাথে মিশিয়ে ফেলে। কথা উঠতে লাগলো। সবাই মিলে অন্য এক পার্টনারকে হিসাব রাখার দায়িত্ব দেওয়া হলো। জালাল উদ্দিনের বাসা কাছে হওয়ায় লেনদেনের সুবিধার জন্য তবু কিছু কিছু কাজ ও টাকা লেনদেন তার মাধ্যমে করাতে হয়। পার্টনাররা তাকে নিয়ে অনেক আশা করে, বিশ্বাস করে। সে প্রায়ই যৌথ টাকা নিজের ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেলে। এই প্রজেক্টের কাজে টাকা নেই বলে, অথচ তার অন্য ব্যক্তিগত প্রজেক্টে টাকা ব্যয় করে। কেউ কেউ মনে মনে বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নেয় না। অনেকেই বলে– ওকে ধরেই আমরা এখানে এসেছি। তার কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনার ঘাটতি, দায়িত্বহীনতা এবং অপচিন্তা উপেক্ষার চোখে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কেউ কিছু বললে তেঁতুল মুন্সির কাছেই বলে। তেঁতুল মুন্সি ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। কথা চালাচালি করেন না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখেন। সহকর্মীদের দিয়ে যৌথ হাতে টাকা খরচ করান।

বিভিন্ন তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়ে গেল। জালাল উদ্দিন বাদে সবাই যার যার অংশের টাকা দিতে থাকলো। জালাল উদ্দিন মুখে বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। তার হাসি-মুখের ছলনা ও মুন্সির সম্বন্ধে হালকা গিবত আরো দুজন অংশীদারের মন জয় করে ফেললো। তারা জালাল উদ্দিনের ছদ্মবেশী মনোভাব বুঝতে ব্যর্থ হলো বা বলা যায় বুঝে না বোঝার ভান করে এড়িয়ে যাওয়ার চালাকি অব্যাহত রাখলো। জালাল উদ্দিন নিজের মনমতো লোক বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির কাজ,

প্লাম্বিং মিস্ত্রির কাজ, গ্রিল মিস্ত্রির কাজ ইত্যাদির জন্য নিয়োগ দেওয়া শুরু করলো। সবাই এটাকে স্বাভাবিকভাবেই নিলো। জালাল উদ্দিনকে না বলতে পারলো না।

তিন তলার ছাদ ঢালাইয়ের সাথে সাথেই বিল্ডিংয়ে দুটো লিফট লাগাতে হবে বলে জালাল উদ্দিন সুর তুলতে লাগলো। দ্বিতীয় লিফট লাগানোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি এবং এ প্রস্তাব আগে দেওয়া হয়নি কেন বলে ইঞ্জিনিয়ার জানালে সে বললো– জায়গা না থাকলে ক্যাপসুল লিফট লাগানোর ব্যবস্থা করা যাবে। কারো কারো সাথে এ নিয়ে হইচই করতে থাকলো, তবে সুবিধা করতে পারলো না। কেউ কেউ বললো, দুটো লিফট লাগানোর পরিবর্তে একটা বড় দামি লিফটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখন আবার দ্বিতীয় লিফট কেন! কয়েক দিন পর জালাল উদ্দিন বলা শুরু করলো– এক লিফটের মধ্যে দুটো মটর লাগিয়ে নিতে হবে, নইলে উপর তলায় উঠা-নামা করা যাবে না। কেউ কেউ ভাবলো, উপর তলায় যাওয়ার কারণ দেখিয়ে টাকা কম দেবে, আবার দুটো লিফট লাগাবে– এটা বেমানান। দুটো লিফট হবে জানলে অনেকেই উপর তলায় ফ্ল্যাট নিত। মুন্সি বললেন– এক লিফটের মধ্যে দুটো মটর লাগানোর কোনো ব্যবস্থা এ দেশে আছে কি-না জানা নেই, থাকলে করে নেওয়া যাবে।

চার তলার ছাদ ঢালাইয়ের সাথে সাথে জালাল উদ্দিন বলা শুরু করলো, উপর তলার ছাদের অর্ধেকটা ফুলের বাগান ও সামনে চৌবাচ্চার মতো করে দিতে পারলে সকাল-সন্ধ্যায় চেয়ার নিয়ে তার পাশে গিয়ে বসা যাবে। আর ছাদের উত্তর ও দক্ষিণ ফ্ল্যাটের পশ্চিম পাশের অর্ধেকটা জুড়ে একপাশে খেলার রুম ও অন্যপাশে মিটিং রুম করা লাগবে। এবার কারো বুঝতে বাকি রইলো না যে, বিভিন্ন কিছু করে জালাল উদ্দিন নিজের সুবিধার জন্য ছাদটা ঢেকে দিতে চাচ্ছে।

ছাদ ঢালাই একের পর এক এগিয়ে চলছে। জালাল উদ্দিনের মনে অস্থির ভাব। আরো কয়েক দিন পর সুর তুললো– মূল ছাদের চারপাশে আরো চার ফুট করে বাড়িয়ে ঘুরিয়ে পায়ে-হাঁটা রাস্তা তৈরি করতে হবে। গ্রীষ্ম-বর্ষায় বাইরে হাঁটাহাঁটি করা কঠিন। ছাদে হাঁটা যাবে। সব কথা ও পরিকল্পনার মধ্যে তার সুবিধাবাদী চরিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে লাগলো। যত রাত যায়, তার সুবিধাবাদী প্রস্তাবের আওতা বাড়ে। জালাল উদ্দিনের মতলববাজির স্বরূপ ক্রমেই অনেকের কাছে উন্মোচিত হতে লাগলো। এক মিটিংয়ে তেঁতুল মুন্সি সকলের মতামত নিয়ে জানিয়ে দিলেন

যে, পুরো ছাদ এভাবে ঢেকে ফেললে চলবে না। মিটিং ও খেলার জন্য উত্তর পাশে একটা বড় কমন-রুম থাকলেই হবে। ছাদ ব্যবহারের উপযোগিতা রাখতে হবে। দক্ষিণ পাশটা খোলা রাখতে হবে, যেখানে বসে চাঁদনি রাতে পাশে বহমান নদী দেখা যাবে। ছাদের চারপাশ ঘিরে ফুলের গাছ লাগানোর জন্য ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া ছাদ সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রয়োজনে যাতে ছোটখাটো অনুষ্ঠান করা যায়, সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে উপরে যিনি থাকবেন, তার সুবিধা ও রোদের তাপের কথা বিবেচনায় রেখে পুরো ছাদ ফুটপাথ টালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। পুব ও পশ্চিম পাশের ছাদ তিন ফুট করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। উত্তর ও দক্ষিণ পাশের ছাদ দেড় ফুট করে বাড়ানো হবে। এ কথায় জালাল উদ্দিন বাদে সবাই সন্তুষ্ট হলো। জালাল উদ্দিন কোনো কথা বললো না। সে রাগে ও ক্ষোভে মনে মনে গজগজ করতে লাগলো। মুন্সির অন্য কল্পিত দোষ-ত্রুটি ধরে কারো কারো কান ভারী করতে লাগলো। ভাবতে লাগলো– অন্যদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া বেশ সহজ হতো, এই তেঁতুল মুন্সি তার সকল স্বার্থ উদ্ধারের পথে বাধা। তেঁতুল মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারের বিল্ডিংয়ের জন্য সার্বিক ভালো যত কাজ জালাল উদ্দিনের কাছে বিষময় ও অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগলো। সে পার্টনারদের মধ্যে বিভাজন তৈরির জন্য মনে মনে উঠেপড়ে লাগলো। কোনো কোনো পার্টনার জালাল উদ্দিনের হাসি-মাখা পাতা ফাঁদে জড়িয়ে গেল।

মিটিংয়ে দু-একজন পার্টনার কোনো পক্ষেই মতামত শক্তভাবে দেয় না। এরা সমাজে নিজেকে ট্যাক্টফুল ভেবে মনে মনে খুব গর্ব অনুভব করে। উদাসীনতা ও উদারতার ভাব দেখায়, আবার পরে মুন্সিকে আলাদাভাবে বলে যে, সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। জালাল উদ্দিনকে বলে যে, আপনারা যেটা করেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এভাবে দু-মুখো নীতি দেখানো শুরু করলো। অতি চালাক ও বর্ণচোরা ভাব বজায় রাখলো। এতে যা কিছু হোক না কেন, সব দোষ তেঁতুল মুন্সির ঘাড়ে গিয়ে বর্তাতে লাগলো।

দু-বছর পেরিয়ে গেছে। জালাল উদ্দিন ভবিষ্যৎকে দেখিয়ে অল্প অল্প করে নামমাত্র টাকা দিয়ে চলেছে। দায়িত্বশীলতার লেশমাত্র নেই। বাড়ির কাছে হলেও সে নির্মাণকাজ দেখার আদৌ সময় দেয় না। সে মাঝে-মাঝেই কথায় কথায়

পার্টনারদেরকে ‘আপনাদের ফ্ল্যাট’ ‘আপনাদের ফ্ল্যাট’ বলতে থাকে। শুধু নিজের ফ্ল্যাটের কাজ চলার সময় নিজে উপস্থিত থেকে কাজগুলো ভালো করে করিয়ে নেয়। অন্য সময় ওদিকে ফিরেও তাকায় না। কারো কারো কাছে বলে– আমি ব্যস্ত মানুষ, আমার সময়ের মূল্য আছে।

জালাল উদ্দিন প্রজেক্টে টাকা কমানোর ফন্দি মনে মনে আঁটে। তেমন একটা সুবিধা করতে পারে না। স্বার্থ পুরোপুরি আদায় হয় না। কি করবে, কি বলবে ভেবে খাঁচার পাখির মতো ছটফট করে, অধৈর্য হয়ে যায়। একদিন এক মিটিং শেষে অনেকেই বসে আছেন। হঠাৎ জালাল উদ্দিন বলে উঠলো, আমার তো এ প্রজেক্টে কোনো টাকা দেয়ার কথাই ছিল না।

মুন্সি জালাল উদ্দিনের কথা ধরলেন। বললেন, আমার জানা মতে এ রকম কোনো কথা কেউ তো আপনাকে কখনো দেয়নি বলে জানি। আপনার কাছ থেকে কে টাকা না নিতে চেয়েছেন নাম বলুন? জালাল উদ্দিন চুপ করে গেল। কিন্তু মনের অন্তর্দাহ অবিরাম জ্বলে।

সবাই গেলে ফোন করে জালাল উদ্দিনকে নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে আনতে হয়। বড় বড় কথা বলে। সময় ও সুযোগ মতো সতীর্থদের নিয়ে আড্ডা জমায়। একটা বিষয়ের বিভিন্ন বিকল্প সমাধান দিতে চায়, নির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসে না। সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখে কাজ দেরি করায়। কাজকে দীর্ঘসূত্রিতার ঘেরাটোপে ফেলে দেয় আর নিজের টাকা না দিয়ে যৌথ টাকায় ফ্ল্যাট করিয়ে নেয়ার বুদ্ধি খোঁজে। মাঝে-মধ্যে নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেয়ারটেকার ও ইঞ্জিনিয়ারের ভুল ধরে দূর থেকে মোবাইল ফোনে ছবি তুলে সবার কাছে গ্রুপ-মেইলে পোস্ট করে। বিল্ডিংকে নিজেদের ভাবে না। লেখে– আপনাদের বিল্ডিংয়ে ঠিকমতো পানি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সে নিজেই কেয়ারটেকারকে ডেকে বলতে পারে, কাজটা করিয়ে নিতে পারে। কেয়ারটেকারকে অন্য পার্টনারের মাধ্যমে জোগাড় করা হয়েছে। তাই তাকে কোনো কিছু করতে বলে না, অন্যকে দিয়ে বলায়। প্রমাণ করতে চায়, এখানকার কেয়ারটেকার কাজ ঠিকমতো করে না। আবার নিজে কাজের ধারেকাছেও যায় না।

আট তলা ঢালাইয়ের পর হঠাৎ একদিন পাঁচ লাখ টাকার কাছাকাছি একটা বিল জালাল উদ্দিন নিজের নামে জমা করার জন্য হিসাব-রাখা পার্টনারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কী কাজে সে ব্যয় করেছে বলতে পারে না। তিন-চার-পাঁচ তলার ছাদ ঢালাইয়ের সময় সম্ভবত কয়েকবারে মোট ঐ টাকা দিয়েছে বলে জানালো। প্রতিটা জমা ও খরচের টাকা লিখে রাখা হয়। টাকা যখন দিয়েছিলেন তখন লিখিয়ে রাখেননি কেন প্রশ্নের উত্তরে বলেছে– আমাকে কি আপনারা অবিশ্বাস করছেন? আমি দিয়েছি এটাই শেষ কথা। কবে দিয়েছি অতশত মনে রাখার সময় আমার নেই। হিসাব-রাখা পার্টনার মুন্সির কাছে জিজ্ঞেস করলেন। মুন্সি বড় গৃহবিবাদ এড়িয়ে যেতে অন্যদের সাথে পরামর্শ করে টাকাটা জালাল উদ্দিনের নামে জমা করে নিতে বললেন। জালাল উদ্দিনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, চতুর কেউ কেউ ভাবলো– এ আর তেমন কি! শেয়ারপ্রতি গড়ে পঁচিশ হাজার টাকা। এটা আমার জন্য তেমন কোনো বোঝা হবে না। তাকে ধরেই না এখানে আসা হয়েছে। টাকা গেলে তো শুধু আমার পকেট থেকে যাবে না, সবার পকেট থেকেই যাবে। তাকে ধরে এখানে থাকতে পারলে ভবিষ্যতে অনেক লাভ আছে। অন্যের জন্য এবং যৌথ কাজে আমি জালাল উদ্দিনের সাথে বিবাদে জড়াবো কেন, তার বিরাগভাজন হতেই-বা যাবো কেন, এটুকু মেনে নেওয়া ভালো।

বিল্ডিং বাবদ জালাল উদ্দিনের দেওয়া টাকা কিছুটা হলেও বাড়লো। প্রজেক্টে 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' রীতি শুরু হয়ে গেল।

জালাল উদ্দিন কর্তৃক নিয়োগকৃত সুপারভাইজার ঠিকমতো সময় দিতে পারে না। নিজের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। জালাল উদ্দিনের শেখানো কথা বলে। তার ব্যক্তিগত কাজেও চলে যায়। জালাল উদ্দিন তাকে প্রশ্রয় দেয়। প্রজেক্টের যৌথ কাজের চেয়ে সুপারভাইজারকে আপন ভাবে। সুপারভাইজারের ফাঁকি তার চোখে পড়ে না। মিটিংয়ে জালাল উদ্দিন তার পক্ষে সাফাই সাক্ষী দেয়। বেশ কিছু জিনিস প্রথম থেকেই তার মাধ্যমে কেনাচ্ছে। সে বলে– সুপারভাইজার সবকিছু কিনে দেবে। ও ভালো লোক। কেনাকাটা করতে গেলে কিছু ব্যবসার মার্জিন তো তার থাকতেই পারে। আমরা কিনতে গেলে জিনিসের দাম নিশ্চয়ই আরো বেশি পড়তো। এতো কিছু হিসাব করতে গেলে বড় কাজ করা যায় না। ও কিনতে থাক। বালি ও ইট ও-ই সাপ্লাই দিতে থাক।

জালাল উদ্দিন যে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি ও প্লাম্বিং মিস্ত্রি দিয়েছে, তারা কাজ ভালো বোঝে না। আবার কাজে ফাঁকি দেয়। বিল্ডিংয়ের কাজকে আটকে রেখে টাকা আদায় করে। জালাল উদ্দিনকে বললে সে এড়িয়ে যায়। এ নিয়ে জালাল উদ্দিন নির্বিকার, উদাসীন। ভিতরে ভিতরে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকে। জালাল উদ্দিনের প্রশ্রয়ে ইঞ্জিনিয়ারের কথাও তারা শুনতে চায় না। তাতে দোষ দেয় ইঞ্জিনিয়ারের। পার্টনারদের কান ভারী করে।

জালাল উদ্দিনের মনের আশা তবু পুরোটা পূরণ হচ্ছে না। রাতে শুয়েও দুশ্চিন্তা। তেঁতুল মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি বিরক্তির ভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। তার বারো জন লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে মাত্র দুটো ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার বাসনা। সে এমন তো বেশি কিছু চায়নি। এই আশাজাগানিয়া প্রজেক্ট থেকে মাত্র দুটো ফ্ল্যাট নামমাত্র টাকায় করে নেওয়া তার টার্গেট। ওদের মাথাটা এতো নরম কেন! ছোটখাটো মাত্র দুটো কাঁঠাল ভাঙতে গেলেও মুন্সি ইশপিশ করে। মুন্সি মিন মাইন্ডেড, মনটা খুব ছোট। সমাজে চলতে পারে না, আধুনিক সমাজ নির্মাণের অযোগ্য।

আশাজাগানিয়া এ প্রজেক্টে দুজন অংশীদার বুঝে হোক, না-বুঝে হোক জালাল উদ্দিনকে সাপোর্ট করে। জালাল উদ্দিনের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট চতুর একজন অন্যদেরকে বললো– জালাল উদ্দিনের সাথে মুন্সির বনিবনা কম, ওটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। করোনা ভাইরাসের কারণে দূরে দূরে থাকাতে দূরত্বটা বেড়ে গেছে। ওসব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের ও নিয়ে নাক না গলানোই ভালো।

সে জালাল উদ্দিনের মতলববাজি বুঝেও বোঝে না, তলে তলে জালাল উদ্দিনকে ভজন করে, এটা অন্যরা বোঝে। ইঞ্জিনিয়ার একদিন মুন্সিকে বললেন– বিল্ডিং ও সবার স্বার্থ দেখতে গিয়ে আমি জালাল উদ্দিনের কাছে একা খারাপ হয়ে যাচ্ছি কেন! এখানে তো আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই!

জালাল উদ্দিন ইতোমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ারের বেশি বেশি দোষ ধরা শুরু করে দিয়েছে।

দশতলার ছাদ ঢালাই চলছে। কন্ট্রাকটর, ঢালাইয়ের জন্য অনেক মিস্ত্রি ও ঢালাই-শ্রমিক, জালাল উদ্দিন, তেঁতুল মুন্সি, পার্টনারদের কেউ কেউ ছাদে উপস্থিত। কন্ট্রাকটর ইঞ্জিনিয়ারের কাছে জিজ্ঞেস করলেন– স্যার, রড কোন দিকে বাড়িয়ে

রাখবো, উত্তর দিকে, না দক্ষিণ দিকে? উপরে তো আবার রুম বানাতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার বললেন– মিটিং রুম ও গেমস রুম তো উত্তর পাশে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে শুনেছি। তাছাড়া দক্ষিণ দিকটা নদীর দিক, খোলা রাখা ভালো।

জালাল উদ্দিন হঠাৎ ক্ষেপে গেল। অগ্নিমূর্তি ধারণ করলো। মুখে যত বিশ্রী ভাষা আছে ইঞ্জিনিয়ারকে সবার সামনে বললো, গালাগালি করলো। পুরোপুরি টাকাওয়ালা গণ্ডমূর্খ জমির দালালের মতো। শুধু হাতে ছুঁয়ে মারলো না। মাছ না পেয়ে ছিপে কামড় বসালো। সবাই নির্বাক, হতভম্ব। পার্টনারদের কিছু না বলতে পেরে ইঞ্জিনিয়ারের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়লো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, কোনো পার্টনার কিছু বলে কি-না। মুন্সি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। জালাল উদ্দিন মনে মনে সাহস ফিরে পেলো। বুঝে ফেললো, অন্য পার্টনাররা তাকে কিছু বলবে না। ইঞ্জিনিয়ার কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অনেকটা 'ধরণী দ্বিধা হও', ওখানে গিয়ে মুখ লুকাই।

মানুষ অন্যায্য ও কায়েমি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে কত নীচে নামতে পারে তেঁতুল মুন্সি তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এ নিয়ে জালাল উদ্দিন-ঘেষা পার্টনারদের কোনো টুঁ শব্দও নেই। তারা সবাই ভালোমানুষ। ওটা জালাল উদ্দিন এবং মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারের ব্যাপার। জালাল উদ্দিন হয়তো কাজটা ঠিক করেনি, কিন্তু আমি মুখ খুলে খারাপ হবো কেন! 'রাম নাম যত সব আমার, শ্রাদ্ধ যত সব তোমার', আমি এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধূর্ত-চালাক আদমি হ্যায়। 'কুঁতে মরবে হাঁস, আর ডিম খাবে দারোগা বাবু'।

তেঁতুল মুন্সি দেখেন, তার দুজন সহকর্মী জালাল উদ্দিনকে নিয়ে বসে আড্ডা দেয়, চা খায়, হাসি-তামাশা করে। একজন কোনো সভায় বা ব্যক্তিগত আলোচনায় অবিবেচনাপ্রসূত-পক্ষপাতদুষ্ট শক্ত কথা বলে একটু হে হে করে হেসে বলে, 'স্যরি টু সে'। তার চালাকি, কথা, মতামত ও পক্ষপাতদুষ্ট কাজ সবাই বুঝলেও সে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করে। জালাল উদ্দিনের গুণগানে পঞ্চমুখ। বলে, জালাল উদ্দিন খুব মিশুক মানুষ। তারা জালাল উদ্দিনের কূটকৌশল, স্বার্থান্ধতা এবং অনৈতিকতার এসব স্বভাবকে আমলে নেয় না। বুঝেও বোঝে না। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে না। জালাল উদ্দিন কৌশলে শুধু মুন্সির নয়, তাদের মাথায়ও কাঁঠাল ভেঙে খেতে চাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রজেক্ট থেকে লাভবান হচ্ছে এবং

আরো হতে চেষ্টা করছে। সে বিষয়ে তারা একচোখা, নির্বিকার, উদাসীন। নির্লজ্জ স্বার্থবাদী জালালের হে হে হাসির প্রেমে পড়ে আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে গেছে। যৌথ স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জালাল উদ্দিনের স্বার্থরক্ষাকারি ও তোষামোদকারির দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছে। তাদের প্রশ্রয়ে যে জালাল উদ্দিন আরো দশ জনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে, জিভ উল্টে ফেলছে, কাজকে পেছাতে পেছাতে প্রজেক্ট ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে– এতে কোনো আত্মজিজ্ঞাসা নেই। অন্যের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা জালাল উদ্দিন পোষা শুরু করে দিয়েছে। আত্মবিশ্লেষণ ও বিবেকের দংশন খুইয়েছে। অগোচরে জালাল উদ্দিনের মতো তারাও মুন্সির খুঁত ও দোষ ধরে বেড়াচ্ছে। পোশাক-আশাক ও মুখের হাসি দেখে মানুষকে চেনা যায় না। কত বহুরূপী ও জঘন্য চরিত্রের মানুষ যে এই সমাজে বাস করে, তা চিনতে চিনতেই মুন্সির জীবন পার হবার উপক্রম হয়েছে। মুন্সি এখন 'কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি' হতে চলেছে।

জালাল উদ্দিনের এখন একটাই কাজ, মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিটা কাজে কত বেশি খুঁটিনাটি দোষ ধরে পার্টনারদের কাছে খারাপ করে তোলা যায়, পার্টনারদের কানভাঙানি যতটা দেওয়া যায়; ততই তার লাভ। কোনো কোনো পার্টনার এতে খুব উৎসাহ পেলো। জালাল উদ্দিনের কাছে কেউ কেউ মাথাটাকে বিক্রি করে দিলো।

পার্টনারের কারো কারো চাতুর্যপূর্ণ এমন আচরণ ও জালাল উদ্দিনের নির্লজ্জ স্বার্থপরতা মুন্সিকে যারপরনাই ব্যথিত করলো। মুন্সি মাঝপথে ছেড়ে আসতেও পারেন না। সাথে বেশ কিছু ঘনিষ্ঠজন আছেন। তাদের কাছেও মুখ থাকে না। সবারই অনেক টাকা বিনিয়োগ হয়ে গেছে। এ বিষয়টাকেও বিবেচনায় রাখতে হয়। অকূল পাথারে পড়লেন। তার সুরে সুর মেলাচ্ছে না বলে জালাল উদ্দিন ইতোমধ্যেই আরো দুজন পার্টনারের পিছু লেগেছে। দোষ ধরছে। তাদেরকে দূরে ঠেলে দিয়ে চাটুকার দুজনকে নিয়ে নিজ বলয় তৈরিতে উঠে-পড়ে লেগেছে। তাদেরকে সাথে নিয়ে গ্রুপিং, বিভেদ ও কুটিল বুদ্ধি পুরোপুরি শুরু করে দিয়েছে। কাজটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে বদ্ধপরিকর, অথচ নিজে নির্মাণ কাজে সময় দিতে চায় না, কখনো ইচ্ছে করে সময় দেয় না। জালাল উদ্দিনের ধামাধরা পার্টনার

পুরোপুরি ভিলেনের ভূমিকায় কাজ করা শুরু করে দিলো। সে বাদে আর সবাই বোঝে যে, সে খলনায়ক। তার কাজকর্ম, কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও মতামতে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায় যে, সে মুন্সিসহ অন্য অনেকের বিরুদ্ধে জালাল উদ্দিনের হয়ে কাজ করে, জালাল উদ্দিনকে সাপোর্ট করে, আবার সে মুখের জোরে নিরপেক্ষ সাজে। উটপাখির মতো বালিতে ঠোঁট গুঁজে নিজেকে লুকায়।

করোনা ভাইরাসের প্রবলতার কারণে সরকার লক-ডাউন ঘোষণা করলো। নির্মাণের কাজ পাঁচ মাস বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর মুন্সি কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আবার কাজে হাত দিলেন। কাজ ভালোভাবেই চলতে থাকলো। জালাল উদ্দিনের কুটিল বুদ্ধি আরো বেগবান হলো।

দিন সামনে চলছে। বিল্ডিংয়ের গাঁথুনির কাজ প্রায় শেষ। জালাল উদ্দিনের কোনো কাজেই মন ভরছে না। বুদ্ধিরও স্থিরতা নেই। এক রাতে একটা ভাবে, তো পরের রাতে অন্যটা। নিজের অংশের কাজ পাঁচ বার ভাঙে, সাত বার গড়ে। তার মনমতো দু-একজনকেও বার বার ভাঙা-গড়ার খেলায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। ওয়াশ রুম পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথনির পরিবর্তে তিন ইঞ্চি ঢালাই দিয়ে দুই ইঞ্চি জায়গা বাড়াচ্ছে। শতেক রকম অভিনব ফন্দি। আবার টাকা দেওয়ার কথা এলেই এড়িয়ে যায়। তবু গাঁথুনির কাজ শেষ হলো। প্লাস্টারের কাজ চলছে। এক মাসের মধ্যে অনেক দূর এগিয়েও গেছে। যারা কাছে থাকে, মুন্সি তাদেরকে নিয়েই কাজ করেন। মুন্সি স্পষ্টত দেখছেন, রাজমিস্ত্রির কাজ, ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, প্লাম্বিং মিস্ত্রির কাজ মনমতো হচ্ছে না। মিস্ত্রিরা ফাঁকি দিচ্ছে। জালাল উদ্দিন শুধু নিজের কাজটা নিজের মতো করে তাদের সাথে থেকে করিয়ে নিচ্ছে। মিস্ত্রিদের কাজের কথা উঠলে তাদের পক্ষ নিচ্ছে। অন্যরা দূরে থাকে বলে তাদের কাজটা যথাসম্ভব দেখা হয় না। জালাল উদ্দিনও তার নিয়োগকৃত সুপারভাইজারকে কাজগুলো দেখতে বলে না। সুপারভাইজারও কাজ দেখার সময় পায় না। মুন্সি এসব বুঝেও নির্বাক। শুধু কাজটাকে যে ভাবেই হোক শেষ করে ফেলার চেষ্টা করছেন।

মুন্সি হঠাৎ করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। জীবন যায় যায় অবস্থা। এক মাস অতিবাহিত হতে চলেছে। মুন্সির করোনায় আক্রান্তের খবরে অনেকেই মর্মাহত হলেন, কিন্তু জালাল উদ্দিনের মতো কিছু পরিচিতজন, যাদের

বাড়া ভাতে মুন্সি ছাই দিয়েছেন, খুব পুলকিত ও আশান্বিত হলো। ভাবলো, এবার মনে হয় অযোগ্য ও দুর্মুখ মুন্সির হাত থেকে এদেশের যৎসামান্য চুগলখোর ও দুর্নীতিবাজ মুক্তি পেলো। জালাল উদ্দিন তো ছাদ ঢালাইয়ের সময় ইঞ্জিনিয়ারের সাথে মারমুখী হয়ে কেউ কিছু না বলাতে নির্মীয়মান ভবনের অর্ধেক দখলে নিয়ে ফেলেছিল। এবার মুন্সির অবস্থা মর মর হওয়ায় বাকি অর্ধেকটা মনে মনে দখলে নিয়ে ফেললো। চলার পথে উৎসাহ পেলো। এর মধ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ শেষ। এক-দুজন মিস্ত্রি টুকিটাকি ভেতরের কাজ করছে। অন্য মিস্ত্রির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এসে মুন্সিকে এক মাস কোয়ারেন্টিনে থাকতে হলো। জীবন আর চলে না। শরীর খুব দুর্বল। বিছানা থেকে উঠতে গেলেই মাথা ঘুরে পড়ে যান। বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজের গতিও থেমে গেছে। ময়লা-আবর্জনায় ভরে পরিত্যক্ত ভবনের রূপ ধারণ করেছে। পার্টনারদের কেউ কেউ গ্রামে চলে গেছে। জালাল উদ্দিনের একদিনও সময় হয়নি বাড়ির পাশের পরিত্যক্ত ভবনের দিকে একবারও উঁকি দেওয়ার। কাজ করানোরও কোনো উদ্যোগ নেই। জালাল উদ্দিন চতুর পার্টনারকে সাথে নিয়ে মুন্সিকে বাদ দেওয়ার কুটিল ফন্দি আটলো। অন্যদেরকে জানতে ও বুঝতে দিলো না।

তিন মাস পর আরো দুজন পার্টনারকে সাথে নিয়ে মুন্সি ভবনে পৌঁছালেন। উপর তলায় ওঠার চেষ্টা করলেন, পেরে উঠলেন না। সাথের অন্য পার্টনাররাও মুন্সিকে দোতলায় না-উঠতে বললেন। কেয়ারটেকার ওখানেই থাকে। মুন্সি সুপারভাইজারকে ফোনে ডাকলেন। প্লাম্বিং মিস্ত্রি ও গ্রিল মিস্ত্রিকে ডেকে আনতে বললেন। তাদের বাড়িও পাশাপাশি। বেজমেন্টের এক হাঁটু পানিসহ আবর্জনা ও নীচতলার আবর্জনা পরিষ্কার করতে বললেন। নীচতলার চারপাশ পুরোটা দেওয়াল ও গ্রিল দিয়ে এক সপ্তাহর মধ্যে ঘিরে ফেলতে বললেন। পরের সপ্তাহে ঐ দুজন পার্টনারকে সাথে নিয়ে আবার আসবেন বলে জানিয়ে চলে এলেন।

বাড়ির নীচতলায় বেজমেন্টে ঢোকার পথের আড়াই ফুট উপরে উঁচু করে গ্লাস-ঘেরা যৌথ বসার-জায়গা তৈরি করার কথা আগেই ছিল। নিজেরা বা সাধারণ অতিথিদের সাথে নিয়ে নীচতলায় বসার একটা ব্যবস্থা। তেঁতুল মুন্সি আরো দুজন পার্টনারকে সাথে নিয়ে এক সপ্তাহ পরে সাইটে গেলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাথে আছেন।

জালাল উদ্দিন বাড়িতে নেই। ওরা মিস্ত্রিকে দেখিয়ে দিয়ে এলেন কীভাবে বসার জায়গা তৈরি করতে হবে।

মিস্ত্রি ইট গাঁথার কাজ শুরু করলে তার গৃহপালিত সুপারভাইজারের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে জালাল উদ্দিন সেখানে গেল। ভাবলো, আবার সেই অবাঞ্ছিত পথের কাটা মুন্সি! রাগ মাথায় উঠে গেল। কাউকে কিছু বললো না। লাথি মেরে পাঁচ ইটের উঁচু গাঁথুনি ভেঙে দিলো। মিস্ত্রিদের কড়াইসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লাথি মেরে দূরে ফেলে দিলো। মিস্ত্রিসহ তেঁতুল মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করলো। মাছ আশানুরূপ না পেয়ে ছিঁপে কামড় দেওয়া চলতে থাকলো। ঘরের কাছে নিজের এলাকায় হওয়ায় এবং স্থানীয় মাস্তানদের সাথে হৃদ্যতা থাকায় জালাল উদ্দিন ক্ষমতার জোর একটু বেশি বেশি খাটানো শুরু করেছে। স্বেচ্ছাচারিতা দেখাচ্ছে। মাস্তানের হুমকি দিচ্ছে। কুটিল চাল চেলে পার্টনারদের মধ্যে ভাঙন ধরাচ্ছে। ইচ্ছে, তেঁতুল মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ারকে এখান থেকে তাড়াতে পারলে স্বার্থ উদ্ধার করা সহজ হবে, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আপদ দূর হবে। সে এখন গায়ের ঝাল ঝাড়ছে। চতুর কেউ কেউ তার ধামাধরা হয়ে কাজ করবে, এটাই আশা। জিভ উল্টে বলা শুরু করে দিয়েছে– ঐ জায়গায় কমন সিটিং-প্লেস না তৈরি করে আমি আমার গাড়ি রাখার জায়গা তৈরি করবো। এখন সে বেজমেন্টের গাড়ির জায়গা থেকে উপরে উঠে আসতে চায়। মাপজোক করে দেখা গেল, ওখানে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা হয় না। সে নাছোড়বান্দা। তবু নতুন পার্কিং ওখানে তৈরি করা গেল না। মুখে মুখে পার্কিং বণ্টনের নীতিমালা পরিবর্তন করলো। অনেককে নিয়ে মিটিং করে চতুর পার্টনার জালাল উদ্দিনের জন্য বেজমেন্টের পরিবর্তে নীচতলায় একটা পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করিয়ে নিলো। অন্যের উদারতা, দান-দাক্ষিণ্য জালাল উদ্দিনের পাওনার গতিক। অন্য অনেকেই বললো, ঠিক আছে, একটু বেশি সুবিধা দিয়ে ওকে শান্ত রাখা যায় কি-না দেখা যাক। মুন্সি অসুস্থতার কারণে মিটিংয়ে যাননি। জালাল উদ্দিন একটু খুশি। তবু খলবুদ্ধি ছাড়লো না। একজন পার্টনারের জালাল উদ্দিনের পক্ষে স্বার্থমুখী হিতোপদেশ অন্য পার্টনারদের উদারতাকে জাগিয়ে তুললো। জালাল উদ্দিন তোষণনীতি শুরু হয়ে গেল। তাতে জালাল উদ্দিনের খলবুদ্ধি আরো বেগবান হলো। প্রকৃতির নিয়ম

বহাল থাকলো– 'খলে ছাড়ে না খলবুদ্ধি, চ্যাঙে ছাড়ে না ঘাই, কুত্তার লেজে তেল মাখালে আরো বাঁকা হয়'।

জিভ ঘোরানো যাদের স্বভাব, দুনিয়াদারিটা তাদের জন্য অতি সহজ হয়ে যায়। তাদের সাথে পারাও কঠিন। জালাল উদ্দিনের ধামাধরা কেউ কেউ কাজের প্রতিবাদ না করে ঘটনাটা দীর্ঘসূত্রিতার ফাঁদে ফেলে ঢিমে-তেতালা গতিতে অনিশ্চিত মীমাংসার দিকে নিয়ে যেতে চাইলো। মুন্সিকে দূরে ঠেলে দিতে চাইলো। এসব দেখে মুন্সির মনটা ঘৃণায় রি রি করতে লাগলো। এত নিকৃষ্ট চিন্তাধারা ও মতলববাজ-স্বার্থপর মন-মানসিকতার লোকজনকে মুন্সি জীবদ্দশায় খুব কম দেখেছেন এবং এ শ্রেণির মানুষ থেকে তিনি সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। তিনি এখন তা পারছেন না। এখন মুন্সির দোরগোড়ায় ইল্লত-নোংরামিতে ভরে গেছে– 'ফেলবি তো ফেল, না ফেললে গন্ধে মর' অবস্থা। আত্মজিজ্ঞাসা এদের আদৌ নেই। আত্মবিশ্লেষণের জায়গা অন্ধকারে ঢাকা। এরা সমাজের শত্রু, মানবতার শত্রু। এদের কথা মাথায় এলেই মুন্সির মনে ঘৃণা চলে আসে, সে-রাতে আর ঘুম আসে না। অথচ বর্তমান সমাজে এদের পদচারণা বেশি। এরাই দামি লোক, এরাই ট্যাক্টফুল বলে স্বীকৃত। দিন শেষে কৃতিত্বের মুকুট এদেরই মাথায়।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো– তাড়াতাড়ি 'ইন্টারন্যাল ডিড' করে ফেলতে হবে। নইলে অনেক বিষয়েই জিভ উল্টানো চলতেই থাকবে। মিটিং ডাকা হলো। জালাল উদ্দিন মিটিংয়ে 'ইন্টারন্যাল ডিডে'র শর্ত নিয়ে প্রশ্ন তুললো। প্রতিটা ক্লজ নিয়ে খুব রাগ দেখালো। প্রতিটি পর্যায়ে ভবনে নিজের দীর্ঘমেয়াদি কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। মিটিংয়ে গরম সুরে কথা বললো। দোতলার লোকদের লোভ দেখালো। অন্যদের কাউকে কাউকে কানভাঙানি দিতে লাগলো। 'কমন বিষয়ের নির্মাণ খরচ সমানভাবে ভাগ করা চলবে না, ফ্ল্যাট নির্মাণ ব্যয়ের মতো আনুপাতিক হারে হবে। নইলে ডিডে সই করবো না। হাতে এলাকার মাস্তান আছে। কেমন করে কাজ চলে দেখবো। সব খরচ আগের নির্ধারিত হারে কম করতে হবে। আমাদের খরচ বেশি হচ্ছে। কেন এত টাকা আমরা দেবো।' একশ ভাগ বহনকারীদের খরচ যে আরো বেশি হচ্ছে, এ বিবেচনা মাথায় আদৌ নেই। অর্থাৎ টাকা আরো কম দিতে চায়। মুখের কথার কী মূল্য আছে, কাগজে তো এখনো সই করিনি।

জালাল উদ্দিন গ্রুপ মেইলে তেতুল মুন্সির চরিত্র হনন শুরু করে দিলো। মহাজ্ঞানীর মত বক্তব্য আওড়াতে লাগলো। প্রজেক্টের আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠাতে লাগলো। ইঞ্জিনিয়ারের দোষ ধরে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলো। জালাল উদ্দিনের ধামাধরা সেই চতুর পার্টনার জালাল উদ্দিনকে সমর্থন করে ও পক্ষপাতদুষ্ট প্রসঙ্গ তুলে 'প্রতিটা বিষয়ে সকলের মতামত দেওয়ার সমান অধিকার আছে' বলে গ্রুপ মেইলে স্ট্যাটাস দিতে লাগলো। আরো দুজন পার্টনারের মগজ ধোলাই চলতে থাকলো। ওদের সাথে নিয়ে গোপন আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলো। বড় বড় কথা গ্রুপ মেইলে লিখে কখনো উড়ো ফায়ার করতে লাগলো। উদ্দেশ্য স্বার্থ উদ্ধার এবং মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ার বিতাড়ন। মুন্সি ও ইঞ্জিনিয়ার তার স্বার্থ হাসিল ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে বাধা। এ কাজে চতুর পার্টনার জালাল উদ্দিনের সহযোগী। পার্টনারদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের জন্য জালাল উদ্দিনের হীন প্রচেষ্টাই যে দায়ী, তা ঐ চতুর পার্টনার বুঝেও না বোঝার ভান করতে লাগলো। মুন্সিকে তাড়ানোর চেষ্টা যে এই হীন প্রচেষ্টা সার্থক করারই একটা পদক্ষেপ, তাও বুঝতে চাইলো না। ইঞ্জিনিয়ারকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। করোনার বিষয়টা বিবেচনা করে ইঞ্জিনিয়ার পাঁচ মাসের বেতন ছাড় দিলেন।

মুন্সি দেখলেন, এ সমাজে দুর্নীতিবাজরাই দুর্নীতির ধুয়ো বেশি বেশি তুলে দুর্নীতিমুক্ত লোকগুলোর মুখে কলঙ্কের কালি লেপে দিয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত করে শান্তিতে দুর্নীতিকর্ম চালিয়ে যাওয়ার মওকা খোঁজে।

মুন্সি মনে মনে ভাবতে লাগলেন– আচ্ছা, জালাল উদ্দিন ও তার দোসরের তিনি কি কোনো ক্ষতি করেছেন? নিশ্চিত না, জ্ঞানত কোনোদিন তিনি তা করেননি। তিনি কি কখনো ওদের কোনো উপকার করেছেন? স্মৃতির গভীরে খুঁজে পেলেন, অনেক উপকার করেছেন। কিন্তু কাউকে বলেননি। মুন্সি নিজের উত্তর নিজেই খুঁজে পেলেন, 'যার করবে হিত, সে করবে তার বিপরীত।' প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো তিনি যেতে পারেন না।

স্বচ্ছতা নিয়ে মুন্সি মুখ খুললেন। বললেন, কেনাকাটা বেশির ভাগ করানো হয়েছে জালাল উদ্দিনের লোক দিয়ে। বাকিটা করা হয়েছে সহকর্মীদের দিয়ে। সহকর্মীরা যৌথ হাতে সব টাকা লেনদেন করেছে। টাকা লেনদেনে কেউ কোনো ফাঁকি

দেয়নি। টাকা মেরে খেলে জালাল উদ্দিন ও তার লোক খেয়েছে। তাতে ভাগ পেলে জালাল উদ্দিনের পাওয়ার কথা, অন্য কারো না। হিসাবে গোঁজামিল দিলে জালাল উদ্দিন অভ্যাসবশত ইচ্ছে করে দিয়েছে। নিজের টাকার সাথে অন্যের টাকা হ-য-ব-র-ল করে লাভবান হয়েছে। যৌথ টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করা তার অভ্যাস। হিসাবে গরমিল করে হিসাব না মেলাতে পারা তার স্বভাব। কোনোদিন তাকে হিসাব নিয়ে বসানো যায়নি। বাধ্য হয়ে অন্যকে হিসাব রাখতে দেওয়া হয়েছে। তার প্রমাণও আছে। আমি কোনো টাকা নিজ হাতে কোনোদিন খরচ করিনি। বাড়ির কাছে কাজ হচ্ছে। বিল্ডিংয়ের প্রতি কোনো আন্তরিকতা জালাল উদ্দিন কোনোদিন দেখায়নি। সব কিছু অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলেছে। মিস্ত্রিদের অতিরিক্ত খাটিয়ে যৌথ টাকায় নিজের ফ্ল্যাট দুটো যাতে বেশি ভালো করে তৈরি করে নেওয়া যায় সেদিকে তৎপর হতে সব সময় দেখা গেছে। ঈদের ছুটির মধ্যে জালাল উদ্দিন নিজের ফ্ল্যাটের পানির লাইন ওভারহেড পানির ট্যাঙ্ক থেকে সরাসরি করিয়ে নিয়েছে। পানির লাইন ও স্যানিটারি লাইনের পাইপ নিজের মতো করে দামি পাইপ ব্যবহার করে করিয়ে নিয়েছে। এতে চতুর পার্টনাররা নিশ্চুপ। জালাল উদ্দিনকে যৌথ কাজের দিকে মন দিতে কখনো দেখা যায়নি। বরাবরই কূটকৌশল খাটিয়ে বাড়তি ফায়দা লোটার চেষ্টা করেছে। বছরের পর বছর টাকা না দিয়ে অন্যের টাকায় ফ্ল্যাট দুটো করিয়ে নিয়েছে। এখন টাকা দিতে নয়ছয় করছে। চতুর পার্টনারদের প্রশ্রয়ে এগুলো করতে সাহস পাচ্ছে।

জালাল উদ্দিন পাঁচ বছর ধরে নাকের ডগায় মুলো ঝুলিয়ে রেখেছে, আর কাজ ক্রমশই পিছিয়ে দিচ্ছে। দুর্নীতির মামলায় টাকা বেশি পেলে পরে হয়তো কিছু টাকা এখানে দেবে বলেছিল। অথচ মামলার টাকা নিয়ে অন্য কোথাও বিনিয়োগ করা শেষ। এ নিয়ে আর কোনো কথা নেই। সবই চুপচাপ। দিন যত যাচ্ছে, নির্মাণ খরচ বেড়েই চলেছে। অনেক নির্দিষ্ট আয়ের পার্টনারদের আয়-রোজগার এখানে বিনিয়োগ করা শেষ। এখন তাদের রিক্তহস্ত। তিন বছরে নির্মিত ভবনে উঠবে বলে সবার পরিকল্পনা ছিল। পাঁচ বছরেও কাজ শেষ হয়নি। ফলে তাদের ভাড়ার বাসায় থাকতে হচ্ছে। কারো কারো এর সাথে ঋণের টাকার কিস্তি দিতে হচ্ছে। কিন্তু এখন জালাল উদ্দিনের টাকা দেবে কে? অন্যরা তাদের অংশের টাকা দিয়ে আর কতদিন

জালাল উদ্দিনের কাজ করে দেবে? জালাল উদ্দিন অন্যের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। টাকা দিচ্ছে না। নানা রকম স্বার্থ-সম্বলিত শর্ত টাকা দেয়ার আগেই জুড়ে দিচ্ছে। চতুর পার্টনার বিষয়গুলো পুরোটাই এড়িয়ে যাচ্ছে। জালাল উদ্দিনের পক্ষ নিয়ে তার স্বার্থবাদী কর্তৃত্বকে প্রজেক্টে প্রতিষ্ঠা করানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। খুঁজে খুঁজে শুধু মুন্সির দোষ ধরার জন্য পিছ লেগে আছে। যৌথ কাজ। জালাল উদ্দিনের কাজ ফেলে রেখে অন্যদের কাজও আলাদাভাবে করা যাচ্ছে না। ফলে সে বিনা টাকায় কাজটা করিয়ে নিচ্ছে। কেউ কেউ বলে, অন্য প্রজেক্টে টাকা ব্যয় করার সময় তার টাকা জোটে, এখানে টাকা দেওয়া জোটে না কেন? লাখ লাখ টাকা বছরের পর বছর এখানে না দিয়ে পার্টনারদের মাথায় ভর দিয়ে খাচ্ছে। এটাই কি কম লাভ? এতো টাকার সময়মূল্য কত? এ নিয়ে তার তোষামোদকারীরা কোনো উচ্চবাচ্য করে না কেন? কথা উঠলেই এড়িয়ে যায় কেন? তার মতলববাজি ধরা পড়ে গেছে। জালাল উদ্দিন নিজের কাজটুকু ছাড়া যৌথ কাজে কোনো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়নি। তার দেওয়া লোকগুলো যৌথ কাজে ফাঁকি দিয়েছে। জালাল উদ্দিন তা না দেখার ভান করে অজানা কারণে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। তার কারণে প্রজেক্টের কাজ শেষ করতে অনেক দেরী হচ্ছে, সে এক বছরের কথা বলে পাঁচ বছর ধরে ঘুরাচ্ছে, অথচ টাকা দিচ্ছে না। বিলম্বের কারণে প্রজেক্টের মোট ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। জালাল উদ্দিন এখন মিটিংয়ে এসে গোঁয়ারতুমি দেখায়। বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করে। কোনো কোনো পার্টনারকে তুই-তোকারি করে। গালাগালি করে। হুমকি দিয়ে মিটিং থেকে উঠে চলে যায়।

জালাল উদ্দিন অস্বচ্ছতার কথা বলে বেশি একটা সুবিধা করতে পারলো না। তবু হাল ছাড়লো না। তার অংশের টাকা দিতে চাইলো না। ইন্টারন্যাল ডিডে সই করলো না। চতুর সহকর্মীকে সাথে নিয়ে তেঁতুল মুন্সির বেশি বেশি দোষ ধরতে লেগে গেলো। জালাল উদ্দিনের ওই শুভাকাঙ্ক্ষীও চিন্তাধারায় একচোখা, স্বার্থপর, ধূর্ত স্বভাবের। বাইম মাছের তুলনায় সামান্য একটু বেশি পিচ্ছিল। গ্র্যাস স্নেক ও আত্ম-প্রবঞ্চক। সে বললো, 'টাকার স্বচ্ছতার বিষয়টা হয়তো-বা জালাল উদ্দিন আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, আমি ওতে কিছু মনে করিনি'। কথাগুলো নিজের গায়ে পেতে নিয়ে জালাল উদ্দিনের পক্ষে ওকালতি শুরু করে দিলো। জালাল

উদ্দিনের প্রকাশ্য স্বার্থের আগুনকে নির্লজ্জভাবে ছাই চাপা দিয়ে পার্টনারদের কাছে ঢাকতে চাইলো। জালাল উদ্দিনের করা অভিযোগগুলো বিবেকবোধকে ফাঁকি দিয়ে হো হো করে হেসেই উড়িয়ে দিলো। অন্যরা কিন্তু তা বুঝলো। মুন্সির প্রতি প্রতিষ্ঠানের কাজে ঐ সহকর্মীর স্বার্থপরতার চাপা অসন্তুষ্টি, মনোমালিন্য, উপদলীয় দ্বন্দ্ব শান্তির বসতবাড়িতে নিয়ে এলো। জালাল উদ্দিনেরও মুন্সির কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ উদ্ধার শেষ। মুন্সিরও চাকরিতে বিদায় বেলা। তাই পড়ন্ত বিকেলে জালাল উদ্দিন ও তার সহযোগী মরা সাপের উপর কয়েক ঘা লাঠি মেরে গায়ের ঝাল ঝাড়ছে, মুন্সিকে কাল্পনিক ও মিথ্যা অভিযোগে হেনস্থা করার ফন্দি এঁটেছে। সবই সময়ের নির্মম পরিহাস।

অসুবিধে হলো, জালাল গং তো সময়মতো কাজ করে না। যৌথ কাজে নিজের সময় ব্যয় করতে চায় না। সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। লাভ ছাড়া এগোতে চায় না। তাছাড়া তাদের আবার আঠারো মাসে বছর। এ ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ার যখন দায়িত্বে ছিলেন না, তখনকার কাজের দায়ভারও তার উপর চাপাতে লাগলো এবং জালাল উদ্দিনের পক্ষপাতদুষ্ট চতুর পার্টনার সেগুলোকে সমর্থন করতে লাগলো। ব্লেইম গেম শুরু হয়ে গেল।

নির্মীয়মাণ ভবনের রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার মিস্ত্রি, কেয়ারটেকার, সুপারভাইজার একে একে মুন্সিকে ফোন করতে লাগলো। অনেক কথার মধ্যে প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছু কথা ভাষা বদল করে তুলে ধরলো। সারমর্মটা এরকম: স্যার, আমরা তো অনেক নিম্ন-পর্যায়ের মানুষ, আপনাদের বেতনভুক কর্মচারি। আপনাদেরকে অনেক উঁচু পর্যায়ের লোক ভেবে সম্মান করতাম। কিন্তু আপনার অবর্তমানে কোনো কোনো পার্টনারের সামনে দুজন পার্টনার আপনাকে নিয়ে যে ভাষায় কথা বলে, কখনো দুজন দাঁড়িয়ে গল্প করে, যেসব কুটিল পরামর্শ করে, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে শুনি ও বুঝি। আপনাদের মতো লোকের মধ্যে যে এত জটিলতা, পরচর্চার স্বভাব, স্বার্থপরতা, ও কূটচাল আছে, আমরা আগে বুঝিনি। আমরা গরিব হলেও আমাদের মধ্যে কিন্তু এত কূটবুদ্ধি নেই। এগুলো কি আপনার কানে যায়? আপনাকে কি কেউ এসব বলে?

মুন্সি ওদের কথাকে এড়িয়ে যান, না-বোঝার ভান করেন। বলেন– আমার সামনে তো এসব কথা কেউ বলে না। আমি বুঝবো কেমন করে? এগুলো নিয়ে তোমরা

ভেবো না। তোমাদের কাজগুলো ভালোভাবে করো। এগুলো আমার কাছে আর কখনো বোলো না। তোমাদের পারিশ্রমিক পেতে কোনো অসুবিধে হলে আমাকে বোলো। মুন্সি ভাবেন– জালাল উদ্দিনের লোকগুলোও দেখছি তার কুমতলব, স্বার্থবাদিতা ও কুটিলতা বোঝে, কাজের কারণে হয়তো তার শরণাপন্ন হতে হয়েছে, কিন্তু জালাল উদ্দিনের স্বরূপ তারা চেনে। আমাকেও চেনে।

মুন্সি দেখলেন, সমাজে যাদের উঁচু-পর্যায়ের লোক বলা হয়, তাদের মধ্যেই ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বেশি, স্বার্থের চাহিদাও তাদের বেশি; জটিল-কুটিল যত ফন্দি। অথচ যাদেরকে নিম্ন-পর্যায়ের মানুষ বলে আমরা অবহেলা করি, তাদের মধ্যে জটিলতা, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট কম, স্বার্থের চাহিদাও কম; তারা অল্পে তুষ্ট।

মুন্সি তার ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে জালাল উদ্দিনের বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন। তার অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে যথাসম্ভব অনুসন্ধান চালালেন। দেখলেন, রাজধানী শহরে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই সবাই চায়। পার্শ্ববর্তী এলাকায় জমি কিনতেও অনেকে এগিয়ে আসে। দুটো কাজেই উপযুক্ত বিশ্বস্ত লোকের বেশ চাহিদা। জমির দালাল ও ডিভেলপারদের প্রতি এসব কাজে মানুষের আস্থা কমে গেছে। জালাল উদ্দিন বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে সে অভাব পূরণ করতে চেয়েছে। এমন অনেক প্রজেক্ট সে এর আগেও করেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় এখনো করে চলেছে। চাপ দাড়ি ঘুরিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা, ধর্মীয় লেবাস আর হাসিমুখের ফাঁদে ফেলে মানুষকে নিয়ে ছোট-বড় গ্রুপ তৈরি করেছে। প্রতিটা গ্রুপকেই রকমারি নামে একটা না একটা প্রজেক্ট ধরিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকের কাছে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার নানাবিধ কৌশল রপ্ত করেছে। প্রতিটা প্রজেক্টের সাথেই নিজে আছে। মিতালির ছদ্মাবরণে প্রজেক্টের রক্ত শোষণ করে মধ্যস্বত্বভোগী দালালি ব্যবসা বজায় রেখেছে। এ এক আজব চরিত্রের মানুষ। আজব তার শোষণ প্রক্রিয়া। এমনই সম্পদের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে যে, তার এ শোষণের কাছে আপন-পর নেই। এ শোষণ প্রক্রিয়া জমি ও ফ্ল্যাট ডিভেলপারদের ব্যবসা-কৌশল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। 'গভীর জলে নাবো আমি চুল ভেজাবো না' তত্ত্বের সার্থক রূপায়ণ। সে এমনভাবে লাভবান হয় বা স্বার্থ শুষে নেয় যে, কাকপক্ষী এমনকি ধূর্ত পাতি শেয়ালও টের পায় না। যে তার পথে বাধা হয় বা যে-ই তার স্বরূপ চিনে ফেলে, তার প্রতিই সে খড়গহস্ত হয়। ভূমিদস্যুরা

মাস্তান পোষে। সেও তা করে। প্রয়োজনে লেলিয়ে দেয়। উচ্ছিষ্ট ছিটিয়ে দলে লোক ভেড়ায়। স্বার্থ রক্ষার্থে সব করে। লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান টাউট। বর্তমান ঘুণেধরা সমাজের অভিনব সৃষ্টি। তার ফন্দিফিকির সব মুন্সির কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই মুন্সি আজ পরিস্থিতির শিকার। জালাল উদ্দিন মুন্সির কারণে এ প্রজেক্ট থেকে প্রত্যাশিত ফায়দা অর্জন করতে পারেনি। এটা মুন্সির অপরাধ। কিন্তু মুন্সির চতুর পার্টনাররা জেগে ঘুমায়। যাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে মুন্সি জালাল উদ্দিনের চক্ষুশূল হয়েছেন, তাদের মধ্যে দু-একজন চতুর পার্টনার আজ জালাল উদ্দিনের হাতের ক্রীড়নক, অকৃতজ্ঞ, কপটাচারী। এতে জালাল উদ্দিন আরো শক্তি পেয়েছে।

মুন্সি জালাল উদ্দিনের মতো অপদেবতা কোন ফুলে তুষ্ট তা জানেন। পথের মল দিয়ে কিভাবে কুকুর পুষতে হয় তাও তিনি ভালো করেই জানেন। মুন্সি অন্যান্য পার্টনারের ঘাড়ে খরচের বোঝা চাপিয়ে জালাল উদ্দিনকে লাভ করিয়ে দিয়ে আত্ম-প্রবঞ্চক হয়ে তাকে খুশি রাখতে পারতেন। পরের ধনে পোদ্দারি করে উভয় পক্ষের কাছে ভালো থাকতে পারতেন। কিন্তু মুন্সি ইচ্ছে করেই অতটা তথাকথিত ট্যাক্টফুল হতে চান না। আত্মপ্রবঞ্চনা করতে চান না। তিনি এ বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক নন। তাই শেষ বয়সে এসে মুন্সির এত মানসিক যাতনা, অপমানের কালিমা। অথচ কোনো কোনো চতুর পার্টনারের বিবেকের কোনো দংশন নেই। নেই কোনো আত্মজিজ্ঞাসা। এ সমাজে এরাই যোগ্য। যোগ্যতমের অধিষ্ঠান।

মুন্সি জালাল উদ্দিনের আরেকটা প্রজেক্টের খোঁজ পেলেন। ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটা চটকদার প্রজেক্ট দেখিয়ে জমির দালালদের সাথে মিলে জমি কেনার নামে অনেকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার সুবিধা হাতিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে প্রজেক্ট পরিত্যক্ত।

মুন্সি দু-তিনজন পার্টনার-সহকর্মীর কাছে কষ্টের কথাগুলো বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তো আমাকে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেন না। আমার অবর্তমানে আপনাদের কাছে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে। আমার অপরাধটা কী, আমাকে বলতে পারেন? আরো বললেন– জালাল উদ্দিন তার মনমতো নিজের ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ দিতে পারলে তার স্বার্থ-উদ্ধারে ষোলো কলা পূর্ণ হতো। কেউই

তখন সেই স্বার্থ উদ্ধারে বাধা দিতে পারতো না। ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সেদিক থেকে রক্ষা করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিংয়ের সার্বিক স্বার্থ দেখেছেন বলে জালাল উদ্দিনের বিরাগভাজন হয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ারের তো কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে ছিল না, যা করেছেন পেশাগত নৈতিকতার বিচারে করেছেন। ইঞ্জিনিয়ার তার শ্রম ও মেধা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এটা আমরা বিবেচনায় আনছিনে কেন? প্রতিটা ক্ষেত্রে তিনি সততা দেখিয়েছেন। নইলে এ ভবনের নাম এতদিনে 'জালাল উদ্দিন মঞ্জিল' হতো। এজন্য ইঞ্জিনিয়ারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। ইঞ্জিনিয়ারের কাজে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতেও পারে। মানুষের অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুলকে উদারতার দৃষ্টিতে না দেখলে মানুষ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। জালাল উদ্দিনের কথায় মেতে ইঞ্জিনিয়ারকে আমরা দোষারোপ করি কী করে? আমাদের বিবেকবোধ কোথায়? ইঞ্জিনিয়ারের সাথে মারমুখী আচরণ করায় আমি তার বাসায় যাওয়া বন্ধ করেছি। লাথি মেরে দেওয়াল ভেঙে আমাকে বিল্ডিংয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নষ্ট করে দিয়েছে। জালাল উদ্দিন লাথি মেরে দেয়াল না ভেঙে মিস্ত্রিকে কাজ বন্ধ রাখতে বলতে পারতো। বলতে পারতো, 'আমার ভিন্নমত আছে, তুমি অন্য কাজ করো, আমরা নিজেরা আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত নেবো'। তা না-করে লাথি মেরে দেয়াল ভেঙেছে। মিস্ত্রিদের সরঞ্জাম লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে। চিৎকার করে গালিগালাজ করেছে, মিস্ত্রিদের সামনে আমাকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেছে। এগুলো বর্বর বুনো সমাজের কর্মকাণ্ড। তারাই 'সকলের মতামত দেওয়ার সমান অধিকার আছে' বলে, আবার তারাই লাথি মেরে দেয়াল ভাঙে। এটা কী ধরণের মানসিকতা? আমি জানি, ইঞ্জিনিয়ার ও আমার কারণে জালাল উদ্দিন তার পুরো স্বার্থ উদ্ধার করতে পারেনি। যদিও আমার কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ আদায়ের কাজ আগেই তার শেষ হয়ে গেছে। এখন আর আমার দরকার নেই।

মুন্সির কথার উত্তরে কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, এতদিন কাজের জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। মুন্সি ছিলেন বলে কাজটা প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে এসেছে। কষ্ট ও পরিশ্রম যা করার করেছেন আমাদের সাথে নিয়ে মুন্সি। তখন তো জালাল উদ্দিন গংয়ের কাউকে ধরে পাওয়া যায়নি। তারা তখন ছিল কোথায়?

অসময়ে টাকা দিয়েছি মুন্সিসহ আমরা। যেইনা কাজটা শেষের দিকে এসেছে, বসন্তের কোকিলরা এখন এসে আসর মাতানোর চেষ্টা করছে। মুন্সিকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, অসংলগ্ন কথা বলছে। মুন্সিকে অপবাদ দিচ্ছে, অপমানিত করছে।

বর্তমানে জালাল উদ্দিন পার্টনারদের সাথে কথায় কথায় 'আমাকে পুরো কাজের ভাউচারসহ হিসাব দিতে হবে' বলে দাবি তুলছে। বিভিন্ন অযৌক্তিক অভিযোগ তুলে পানি ঘোলা করতে চেষ্টা করছে। এসব অভিযোগে চতুর পার্টনাররা তাকে কিছু না বলে মুখে কুলুপ এটে ঘাপটি মেরে থাকতে চায়। মুন্সির কানে এসব কথা পৌঁছল। মুন্সি জালাল উদ্দিন কর্তৃক নিয়োগকৃত সুপারভাইজারকে দু-জন পার্টনারের সামনে ডাকলেন। এই দীর্ঘ সময়ের হিসাবের খাতা ও খরচের ভাউচারসমূহ এখন কোথায় আছে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, 'কাজের প্রথম থেকেই জালাল উদ্দিনের কাছে প্রতি দু-তিন মাস পর পর সমস্ত হিসাব ভাউচারসহ জমা রাখতাম, যা আপনারা সবাই জানতেন। সব হিসাবপত্র তার কাছেই ছিল। গত দু-মাস আগে জালাল উদ্দিন আমাকে ডেকে কিছু কাগজপত্র বর্তমান ইঞ্জিনিয়ারকে পৌঁছে দিতে বলে। আমি তা দিয়েছি। এর পরের ঘটনা আমি আর জানিনে।'

মুন্সি বললেন– জালাল উদ্দিন হিসাব বিভাগে চাকরি করেছে। হিসাবব্যবস্থার আদ্যপ্রান্ত তার জানা। প্রজেক্টের শুরুতেই তার সহ আরো দু-জন পার্টনারকে সাথে দিয়ে ব্যাংকে যৌথ হিসাব খোলা হয়েছিল। হিসাব সে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। দু-জনের মধ্যে একজন পার্টনার আজ পর্যন্ত যে যত টাকা জমা দিয়েছে এক্সেল-শীটে হিসাব রেখে আসছে। আমরা কাজ শেষে জালাল উদ্দিনের কাছে হিসাব চাইবো। জালাল উদ্দিন শেষে এসে হিসাবের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য সে-ই আগে আগে অন্যের কাছে হিসাব চাওয়ার সুর তুলছে। জালাল উদ্দিনের টাউটারি ব্যবসার ফন্দি-ফিকির সময়ান্তে প্রতিটা লোকই বোঝে। কেউ জেগে ঘুমায়, কেউ-বা মনঃকষ্টে ভোগে। তহবিল আত্মসাতের সরকারি কেস থেকে টাকার বিনিময়ে পার পাওয়া যায়, কিন্তু সহকর্মীদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করে আত্মদংশন থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। অবশ্য খলের ছলের অভাব হয় না।

মুন্সি পার্টনারদের এসব কথায় আবেগতাড়িত হলেন না। বলে চললেন– স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় না এলে মানুষ চেনা যায় না। জালাল উদ্দিন যে এত স্বার্থপর ও জঘন্য স্বভাবের লোক, এ কাজে না এলে আমরা কখনোই তা বুঝতাম না। বুঝেছি, সম্মান রক্ষা করে এখানে টিকে থাকা যাবে না। জালাল উদ্দিনের মতো কুটিল ও স্বার্থবাদী লোক ছাড়াও ধূর্ত-বিবেকহীন লোক এখানে আরো আছে, যে বা যারা জালাল উদ্দিনের ধামাধরা হয়ে কাজ করছে। 'জ্ঞানী বোঝে ইশারায়, মূর্খ বোঝে কিলে।' প্রথমেই তাকে ইশারায় আমার বুঝতে হতো। আমি কিল খাওয়ার পর এখন বুঝছি। সবার জন্য শান্তির আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে সবাইকে অশান্তিতে রাখছি। জালাল উদ্দিন লাথি মেরে দেয়াল ভাঙেনি, ভেঙেছে আমার মন, সম্মান ও আমার বুকের পাঁজর। আমি নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে সম্মান বাঁচিয়ে চলতে চাই। আপনারা ভবন নির্মাণ কাজ শেষ করুন। প্রশান্তির মরুদ্যানে বসবাসের স্বপ্ন দেখুন। আমার অংশের টাকা আমি দিতে থাকবো। এখানে আপনাদের অনেক বিনিয়োগ। বর্তমান সমাজে নীতির তুলনায় বিনিয়োগের মূল্য বেশি। এ সম্পদের মোহ কোনোদিনই আমাকে আকর্ষণ করে না। এদেশে চোর ও মাস্তানের কদর বেশি। আবার চোরের মায়ের বড় গলা। আইনের শাসন থাকলে আইনের ছায়াতলে আমরা দাঁড়াতে পারতাম। জালাল উদ্দিন গং টাকা ঢেলে এদেশের আইনকে নিজের মনমতো চালাচ্ছে। তাই সে দুর্নীতিবাজ হয়েও পার পেয়ে যাচ্ছে। সরকারি টাকা মামলার মাধ্যমে উল্টো পকেটে ভরছে। রাজনীতির বিষবাষ্প সমাজের পুরো এথিক্সটাই নষ্ট করে ফেলেছে। তাই আমাদের মতো লোকের সমাজে চলাফেরা করা ও টিকে থাকা খুব কঠিন হচ্ছে। আমি শুধু জীবন চলার পথে আপনাদেরকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। এত নিম্ন পর্যায়ের জটিল-কুটিল চিন্তা করার সময় আমার কোথায়! আমি মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব জনে জনে খুঁজে ফিরি। এ খোঁজা আমার নিরন্তর। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মানুষের সংখ্যা বেশি, অথচ মনুষ্যত্বের সংকট বিদ্যমান। ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রিক জীবনাচার ও কর্ম; ব্যক্তি-স্বার্থের প্রাবল্যে সামষ্টিক উন্নয়ন-ধারা মুখ থুবড়ে পড়েছে। চলার পথে যে খণ্ডকালীন সহকর্মীর সাহচর্য ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আমরা সবাই শান্তির আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে এসেছিলাম, আজ তারই বর্ণচোরা স্বার্থান্ধ স্বভাবের কারণে স্বার্থের চোরাবালির ফাঁদে আমরা আটকে গেছি। আমরা আমাদের অজান্তেই জমি-বিল্ডিং কেনা-বেচার দালালের খপ্পরে পড়ে গেছি।

এখন এ আশ্রয় ছেড়ে দূরে সরে যাওয়াটাই জীবনের বড় শাস্তি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বেশ কিছু পার্টনার আমাকে দেখে এই প্রজেক্টে এসেছিল। আমি হঠাৎ এ প্রজেক্ট ছেড়ে চলে গেলে তাদেরকে জালাল উদ্দিনের বিকৃত স্বার্থ-বাসনার প্রত্যক্ষ তোপে ফেলে দেওয়া হবে। জালাল উদ্দিন সহকর্মীদের শোষণ ও পাজির-পা-ঝাড়া স্বভাবের মধ্যে নিজের শান্তি খুঁজে পেয়েছে। রক্ষকের বেশে সে ভক্ষক হয়ে গেছে। পার্টনারদের মধ্যে কেউ কেউ অকৃতজ্ঞ-ঘরভেদী জালাল-পূজক হওয়ায় জালালের কুচক্রি কর্মকাণ্ডের হালে বাতাস লেগেছে। সে পার পেয়ে যাচ্ছে। জালাল উদ্দিন তার আসল রূপে ফিরে এসেছে। আপনাদের এ সুখের আশ্রয় হয়তো আমার জীবনের শেষ আবাসস্থলের স্বপ্ন নয়। হয়তো আমার নতুন আবাসস্থলের খোঁজ আবার করতে হবে। আবার অন্য কোথাও– অন্য কোনো পথে, যেখানে শুয়ে আমি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাসটা ছাড়তে চাই। জালাল উদ্দিন ও তার সহযোগীদের এ রূপ আমার মাতৃভূমির বর্তমান স্বরূপ। এ দেশের এই মানুষজনকে নিয়ে আমাদের নিত্য বসবাস। এদেশে জালাল উদ্দিন গংয়ের অস্তিত্ব ও প্রাবল্য সামাজিক অশান্তির মূল কারণ। চলতে পথে বার বার দেখা হবে, হয়তো আর ফিরে আসা হবে না।

ফ্লাট-বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। পার্টনারদের অনেকে এখন আগ্রহী হয়ে অবশিষ্ট কাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসা শুরু করেছে। মুন্সির খোঁজ-খবর অনেকেই রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। একদিন রাতে শুয়ে সায়মা জালাল উদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলো– আমাদের ঐ প্রজেক্টের কাজ শেষ হতে আর কদিন বাকি? তুমিই-না বলেছিলে, তেমন একটা খরচ-খরচা হবে না। প্রজেক্টে লাভের পরিমাণ কেমন হলো?

জালাল উদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দিলো– আমার স্বার্থের কাজে বাধা দেয়ায় মুন্সিকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি। তুমি তো আমাকে চেনো। আমার সাথে লাগালাগি করতে এলে আমি কাউকে ছাড়িনে। তুমি জানো, সব প্রজেক্ট থেকে আশানুরূপ লাভ হয় না।

(পল্লবী, ঢাকা: ১৭.০৬.২০২১)

কুমারী মায়ের স্বর্গযাত্রা

বাতাসের পাখায় ভর করে দ্রুতবেগে ভেসে-চলা মেঘের মতো জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত সামনের দিকে মেঘের ছায়ার সাথে পাল্লা দিয়ে ধেয়ে চলেছে কোনো এক দূর অজানায়। এই তো সে-দিনের কথা। দেখতে দেখতে অনেকটা বছর পার হয়ে গেল। জুড়োন ঘোষ এক মুহূর্তও মেয়েটার স্মৃতি ভুলতে পারে না। যে যা-ই বলুক, বাপ তো! সে জীবন্মৃত হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। মেয়ের স্মৃতি তাকে পিছন থেকে তাড়া করে চলেছে। জুড়োন ঘোষ চোখ বুজলেই যেন মেয়েটা তাকে ডাকে, বলে– বাবা, তুমি আমাকে কোন নরকে রেখে গেলে? তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারলে? আমি যে তোমাকে দেবতার মতো ভক্তি করতাম বাবা। জুড়োন ঘোষ মুখে হাত দিয়ে ঘরের পিঁড়েয় বসে কী যেন আনমনে ভাবছে, তা সে নিজেও বোঝে না। হয়তো ভাবছে, অমল ঘোষের উপর বিশ্বাস রাখা তার ঠিক হয়নি। হাতের তীর একবার চলে গেলে কিছুই আর করার থাকে না, শুধু হা-হুতাশ ছাড়া। বউ তাকে বলছে– সকাল দশটা যে বেজে গেল। যাও, সকালের খাবারটা খেয়ে নাও।

জুড়োন ঘোষের বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে, বয়সের হিসাব তার নেই। সে তার বাবার মুখে শুনেছে, দেশবিভাগের আগেই তার জন্ম। চলাফেরা তেমন আর করতে পারে না। কোমর নুয়ে গেছে। পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তায় শরীরটা অকালেই ভেঙে গেছে। এখন ঘরে বসে থাকে। বড় ছেলের সংসারে সে, আর মেজো ছেলের সংসারে বউ বসে বসে খায়। বলে– ঠাকুর যে কদিন বাঁচিয়ে রাখেন এভাবে পুড়ে পুড়েই সরে পড়তে হবে। সবই ঠাকুরের ইচ্ছে। ঠাকুর যেন আমার শেফালীকে মঙ্গল করেন। আমিও শেষমেষ ভারতবাসী হলাম। তখন কেন শেফালীকে সাথে নিয়ে আগে আগেই চলে এলাম না। মেয়েকে অমল ঘোষের কথামতো হাতছাড়া করলাম কেন! ভগবান আমাকে সহ্য করার শক্তি দাও, আমাকে রক্ষা করো!

জুড়োন ঘোষের আট সন্তান, চার মেয়ে চার ছেলে। এ দেশের এক অজ-পাড়াগাঁয়ে বসবাস। মাঠে মাত্র ছয়-সাত বিঘে জমি। কৃষিকাজ তার পেশা। ছেলেগুলোকে মাঠ ধরিয়েছে। একজোড়া বলদ গরু আছে, লাঙল বওয়ার কাজে লাগে। কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে। অভাবের সাথে নিত্য সংগ্রাম। মেয়েদের মধ্যে শেফালীই বড়। প্রথম মেয়ে বলে

ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের খুব আদুরে। এ-যুগে আট ছেলেমেয়ে বলে পাঁড়ার অনেকেই এ দম্পতিকে নিয়ে রসিকতা করে। কেউ বলে– জুড়োনদা সগ্গের পুরোটাই একা দখল করবে। ঠাকুরপোরা বৌদিকে বলে– বৌদির বয়স বাড়লে কী হবে, দেখতে এখনো অল্পবয়সী বলে মনে হয়। এখনো বউদির কোলে ছোট বাচ্চা ভালো মানায়। বৌদি বলে– না গো ঠাকুরপো, আমাদের দিন শেষ। এখন তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছি। অমল ঘোষ রসিক মানুষ। সকালে উঠেই দোকানে বসে উপস্থিত সবাইকে বলছে– গতকাল সন্ধেয় দেখি জুড়োনদা একটা হারিকেন হাতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ছেলেমেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সন্ধের পর সবগুলোকে খাইয়ে ঘরের পিঁড়েয় শোয়ায়। শুইয়ে গুনে দেখে। গতকাল গুনে দেখেছে একটা কম। তাই খুঁজতে বেরিয়েছে। কোনটা হারিয়েছে, সে বলতে পারছে না।

অমল ঘোষেরা দূর সম্পর্কীয় দু-ঘর কায়স্থ এই গ্রামে বাস করে। আরেক ঘরে আছে গৌতম ঘোষ। বয়সে অমল ঘোষের চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের ছোট। অমল ঘোষ নিজেদের উচ্চবর্ণের ঘোষ বলে দাবি করে। বলে জুড়োনদাদের মতো আমরা ঐ ঘোষ না। আমাদের পূর্বপুরুষ জমিদার ছিল। আমরা ব্রাহ্মণ বর্ণের ঘোষ। জুড়োনদারা কৃষিকাজ করে। ওরা বৈশ্য বর্ণের কাছাকাছি ঘোষ। এ কারণে আমাদের মাঠে জমি থাকলেও চাষাবাদ করতে পারিনে। সেজন্য বাড়ির সামনে দোকান দিয়ে বসেছি।

বর্ণভেদ এদের মনের মধ্যে থাকলেও এ গ্রামের হিন্দুপাড়ায় কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত ও ঘোষেরা মিলেমিশে একজোট হয়ে বসবাস করে। সাতচল্লিশের দেশভাগের সময় বেশ কয়েক ঘর স্বজাতি ওপারে চলে গিয়েছিল। তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। গৌতম ঘোষের বাবা মারা গেছে। এ পাড়ার বিপদাপদে গৌতম ঘোষের মা অমৃত রাণী ঘোষের পরামর্শমতো সবাই চলে। সে সুবাদে পাড়ার সবার বাড়িতেই গৌতম ঘোষের অবাধ যাতায়াত। জুড়োন ঘোষের বড় ছেলে মাধব ঘোষ, পালপাড়ার আনন্দ পাল ও ধীরেন পাল গৌতম ঘোষের জুটি। গৌতম ঘোষের এসএসসি পাস করার পর পড়া বাদ গেছে। সাথীরা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শেষ ধাপ পর্যন্ত গেছে। গৌতম ঘোষের জেলা শহরে যাতায়াত বেশি। বাবা মারা যাবার পর থেকে জমিজমার মামলা চালাতে মাকে সাথে নিয়ে কোর্ট-কাচারি পর্যন্ত দৌড়াতে

হয়। এছাড়া ভারতে যাবার পাসপোর্ট ও পাসপোর্টে ভিসা লাগানোর দালালি করে। এতে পয়সা ভালো। আবার এপার-ওপার যাতায়াত। ফলে কথাবার্তায় চৌকস, চালাক-চতুর।

অমল ঘোষের দোকানে পাড়ার যত ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা। শোনা যায়, রাতে দোকানের মধ্যে বসে তালের বা খেজুরের রস ও ভাত পচিয়ে ঘরে তৈরি তাড়িও নেশার জন্য চলে। অমল ঘোষের ঠোঁট খুব পাতলা। তার মুখে মুখ ধরা শক্ত। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই লেখাপড়ার ইতি টেনেছে। সে পাড়ার খারাপ সঙ্গে মেশে। সময়-সুযোগমতো চোরাপথে ভারতে বেড়াতে চলে যায়। দু কূল রক্ষা করে চলে। এখান থেকে সীমান্ত বড় জোর পঁচিশ মাইল হবে।

অবাধ যাতায়াতের মধ্য দিয়ে জুড়োন ঘোষের বড় মেয়ে শেফালীর সাথে গৌতম ঘোষের সখ্য। শেফালীর বয়স সতেরো পেরিয়েছে। গৌতম জুটিদের সাথে নিয়ে মাধবদের বাড়িতে যায়। চার জুটি মিলে গল্পগুজব করে। শেফালীও গৌতমের সাথে রসিকতা করে কথা বলে। দাদা বলে ডাকে। একান্তে কথা বলার সুযোগ খোঁজে। শেফালীর হাসি হাসি মুখের কথা গৌতমের খুব ভালো লাগে। যদিও জুড়োন ঘোষের মতো নিম্ন সম্প্রদায়ে আত্মীয়তা করার কোনো ইচ্ছেই গৌতমের নেই, তবু শেফালীর হাতছানিতে গৌতমের সাড়া দিতে ইচ্ছে করে। শেফালীর সাথে একাকী কথা বলতে ভালো লাগে। ভালো লাগে কাছে পেতে। হয়তো-বা বয়সের ধর্ম। দুজনেরই উঠতি বয়স, রঙিন মন, অপক্ক চিন্তাভাবনা, পরিণতির প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব। শেফালী ভাবে, দুজনই যখন ঘোষ সম্প্রদায়ের, তাহলে মেলামেশায় অসুবিধে কোথায়! কথা বলতে বলতে ভাব গভীর হলো। গৌতমদের বাড়ির পাশে পুকুর। পুকুরে আসা-যাওয়ার পথে গৌতমের সাথে দেখা হয়। একাকী চলতি-পথে কথা হয়। জুড়োন ঘোষের বাড়ির দক্ষিণ পাশ ঘেঁষে বিশাল এলাকাজুড়ে এলোমেলো বন-বাদাড়, বাঁশঝাড়। মাঝখানে একটা উঁচু বড় তেঁতুলগাছ, সুনিবিড় ছায়া। গাছের উপরের ডালে আট-দশটা বনেদি শকুন বাস করে। এরা গ্রামের মাতব্বরদের মতো এলাকার পশু-প্রাণির শবদেহের যত মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। দিনের বেলাতেও বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ওদিকে কেউ তেমন একটা যায় না। শুরু হলো রাতের আধারে তেঁতুলতলায় গিয়ে দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ, একান্তে পাওয়া।

দুমাসের মধ্যেই তাদের অন্তরঙ্গতা ধরা পড়ে গেল গৌতমের জুটি আনন্দ পালের কাছে। গৌতম আনন্দের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হলো শেফালীকে বিয়ে করার অপারগতার কথা। বর্ণ ও অসম সম্প্রদায়– কোনোভাবেই ধর্ম এটা মেনে নেবে না। তাছাড়া একেবারেই বাড়ির কাছে। মেনে নেবে না মা-ও। সে নিজেও এ বিষয়ে সচেতন। জুড়োন ঘোষ তার শ্বশুর হবে, এটা বেখাপ্পা লাগে, অসম্ভব। এতো গভীরভাবে ভেবে সে এ-পথে পা দেয়নি। কিন্তু এখন পিছনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বয়সেরও তো একটা ধর্ম আছে! কথা শুনে আনন্দ পালও সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলো না। সেও গৌতমের সহায়তায় আনন্দধামে যোগ দিলো। আনন্দকে গৌতম সুযোগ দিতে বাধ্য হলো। শেফালীরও না বলার মতো কোনো পথ থাকলো না। আসা-যাওয়া চলতে থাকলো। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ধীরেন পালের কাছেও বিষয়টা অজানা রইলো না। তিনজনের ফাঁদে না-পড়ে শেফালীর গত্যন্তর থাকলো না। এ পর্যায় থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া জীবন-অনভিজ্ঞ এক তরুণীর জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। শেষে জানাজানি হয়, কুল যায়, বাবা-মায়ের মান যায়। শেফালী তিনজনের হাতে কলের পুতুল হয়ে গেছে। গৌতম ও সাথী দুজনেরও বয়সের চাওয়া পূরণের শেষাশ্রয় শেফালী।

বছর না পেরোতেই শেফালী কুমারী মা হতে চলেছে। তিন মাস পর শেফালী বুঝতে পারলো। জীবনের এত বাস্তবতা তার জানা নেই। সে শুধু জীবনের উথাল-পাথাল ঢেউয়ের তালে তালে গভীর জলে ভাসতে জানে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে অথই জলে তলিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা এই নতুন। ফাঁদে পড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এখন 'শিঁকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা ভাঙিতে না পারে, পাখি ছটফটাইয়া মরে, পাখি ধড়ফড়াইয়া মরে'। সে তার মাকে কিছু বললো না। বড্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত এটাই ভাবলো, পাঁড়ার সবাইকে জানিয়ে চাপে ফেলে সে গৌতমকে বিয়ে করবে। গৌতমের ভালো জমাজমি আছে। অন্য দুজনের কথা সে চেপে যাবে। পাঁচ মাস পর বাড়িতে জানাজানি হলো। পাঁড়া থেকে গ্রামের প্রতিটা মানুষের মুখে মুখে খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। কুকথা বাতাসের আগে ছোটে। তাকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা শেফালীর নেই।

জুড়োন ঘোষ পাড়ায় বিচার বসালো। কোনো বিহিত হলো না। গ্রামের মণ্ডল-মাতব্বর ডাকা হলো। বিচার বসলো। রাত-চরা বাহিনীর ছদ্মবেশী লোকজনসহ গ্রামের লোকজন এলো। বিচারে আলেক মাতব্বরের বড় গলা, সুবিচারক, চিৎকার করে কথা বলতে পারে। রাত-চরা বাহিনী ও গ্রামের যুবসমাজের সাথে সখ্য। পাঁচ ভাই, লাঠির জোর আছে। চাষ করে অনেক ধান গোলাঘরে তোলে। তাই গ্রাম্যসমাজে কথার কদর। তার এক কথা, মেয়ে যার নাম বলছে, বিয়ে তাকেই করতে হবে। বিয়ে করতে আমরা বাধ্য করবো।

আলেক মাতব্বরের কথায় জুড়োন ঘোষ ও শেফালী আশার আলো খুঁজে পায়। তাই তাকে মান্য করে। তার পিছ পিছ ঘোরে। রাত-চরা বাহিনীরও এলাকায় বেশ প্রভাব। জুড়োন ঘোষ তাদেরকেও মান্য করে। বিচারে জিতবে এই আশা করে। গ্রাম্য বিচারের উপর নির্ভর করে। ভাবে ঝামেলা না বাড়িয়ে বিয়েটা হয়ে গেলেই ভালো। মামলায় গেলে কাজের কাজ তেমন কিছুই হবে না, কেবল খরচ-খরচা বাড়বে। জেল-হাজত বাড়বে। শেষে মেয়েটার কপাল পুড়বে। আবার মামলা করে তো আর আত্মীয়তা হয় না। সে তুলনায় রাত-চরা বাহিনীর লোকজন ও আলেক মাতব্বরের বিচারে বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে সেটাই উত্তম পথ।

বিচারে গৌতমকে ডাকা হলো। গৌতমের বক্তব্য– মেয়ে বললেই হবে নাকি? আমি এর জন্য দায়ী না। মেয়েকে চাপ দিয়ে সঠিক নামটা বের করেন। আমি ওদের বাড়িতে যাতায়াত করি বটে। আমি মাইরি বলছি, ও সন্তান আমার না। আমি কালী ঘরে উঠে বলতে পারি, ও সন্তান আমার না।

বিচারে আলেক মাতব্বর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলো। মেয়ে যখন নিজ মুখে স্বীকার করছে, সুতরাং বিয়ে গৌতমকে করতেই হবে। আলেক মাতব্বরের উচিত কথাতে গ্রামের সবাই রাজি। আলেক মাতব্বর সত্যিই একজন কড়া মাতব্বর, যুবক বয়স, ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে প্যাঁচের কথা বলতে পারে, উচ্চতায় ঘন-গিরে, 'বুদ্ধিতে অতি বড় পাকা সে'। উচিত কথা বলতে বাপকেও ছাড়ে না।

ওই দিনের মিটিং ভেঙে গেলো। পনেরো দিন পর আবার মিটিংয়ের দিন পড়লো। রাত-চরা বাহিনী হুমকি দিতে লাগলো, প্রয়োজনে গৌতমকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

আলেক মাতব্বরসহ উপস্থিত সবাই একমত হলো, ঐ-দিন ঠাকুর ডেকে বিয়ে হয়ে যাবে। নইলে এলাকায় রাত-চরা বাহিনী আছে, তাদের হাতে গৌতমকে তুলে দিলেই হবে। গৌতম পালাবে কোথায়! মাঠের এতো জমা-জমি ফেলে কোথাও পালাতে পারবে না।

অমৃত রাণী ঘোষ কোর্ট-কাচারি ঘাঁটা মামলাবাজ মহিলা। মুখের কাছে উকিল ফেল। বাতাস বুঝে ছেপ ফেলতে জানে, মানুষ বুঝে খেপ মারতে জানে। বুদ্ধির অন্ত নেই। তিন দিন পর বেশ রাতে অমৃত রাণী ঘোষ এলো আলেক মাতব্বরের বাড়িতে। আলেকের বউকে বললো– মা, আমি আলেকের সাথে দুটো কথা বলতে চাই। ওর সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। আলেক মাতব্বরের সাথে ঘরে বসে বৈঠক হলো। বাবা আলেক, তোমরা ছাড়া এ এলাকায় আমাকে দেখে রাখার কেউ নেই। তোমার কাকা তো সেই কবেই গঙ্গা পেয়েছে। তোমাদের ধরেই এ দেশে থাকা। নইলে সেই কবেই ওপারে চলে যেতাম। মামলা-মকদ্দমা নিয়ে বড়ো কষ্টে আছি। গৌতম তো তোমার সাথে কিছুদিন ব্যবসাপাতিও করেছে। সে তোমার ছোট ভাইয়ের মতো। সে যদি অন্যায় করে থাকে তার বিচার তোমরা করো। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। গৌতমের শাস্তি পাওয়া উচিত। গৌতম শহরে ভারতীয় পাসপোর্ট-ভিসার ব্যবসা করার জন্য একটা অফিস নিতে চাচ্ছে। বড় হাতকষ্টে পড়ে গেছি। আমাকে কিছু টাকা অন্তত দাও। রেজিস্ট্রি খরচটা জোগাড় করে কয়েক দিনের মধ্যে পুব মাঠের ঐ এক-দাগে তিন বিঘে জমিটা রেজিস্ট্রি করে নাও। পরে এক সময় বাকি টাকাটা পারলে দিয়ে দিও। দাম-দর পরে হবে।

আলেক মাতব্বর আমতা আমতা করতে লাগলো। বললো– জমি যখন বেচতেই চাচ্ছেন, আরো এক বিঘে একবারে দিয়ে দেন। একসঙ্গে রেজিস্ট্রি করে রাখি। টাকার ব্যবস্থা পরে করা যাবে। রেজিস্ট্রি অফিসে গৌতম যেন আমার সাথে দেখা করে। কিছু পরামর্শ দেবো। ও তো আমার ছোট ভাইয়ের মতো। আর রাত-চরা বাহিনীকে আপনাকেই সামলাতে হবে। কিছু খরচাপাতি ছাড়া মনে হয় রাজি হবে না।

অল্প কিছু টাকা হাতে দিয়ে গোপনে জমি রেজিস্ট্রি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

আবার আলেক মাতব্বরসহ গ্রামের ও রাত-চরা বাহিনীর লোকজন নিয়ে নির্ধারিত দিনে বড় মিটিং বসলো। মিটিংয়ে ঠাকুর এসেছে। শোরগোল উঠলো, বিয়ে হয়েই যাবে। গৌতম জনসমক্ষে বললো– বিয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে সন্তান আগে জন্ম নিক। সন্তানের রক্ত পরীক্ষা করানো হবে। আমার রক্তের গ্রুপের সাথে মিললে আমি অবশ্যই বিয়ে করবো। আমি জানি ও সন্তান আমার না। ওদের বাড়িতে তো আমি ছাড়াও আনন্দ পাল ও ধীরেন পাল যাতায়াত করে। রক্ত পরীক্ষা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমার প্রতি বিচার চাপিয়ে দেওয়া হবে। আমি সংখ্যালঘু বলে ও আমার কিছু জমি-জমা আছে বলে আমার উপর বিচার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েও আমার নাম বলছে। রক্ত পরীক্ষা আনন্দ পাল ও ধীরেন পালেরও করানো লাগবে। আপনাদের কাছে আমি সুবিচার প্রার্থী।

গৌতমের কথা শেষ হতে না হতেই আলেক মাতব্বর কথা পাড়লো। সে তো বরাবরই উচিত বক্তা। সে বললো– গৌতমের কথা একদিক থেকে ঠিক। হতে পারে গৌতমের জমি-জমা আছে বলে মেয়ে ওর নাম বলছে। আনন্দ পাল বা ধীরেন পালও তো ওদের বাড়িতে যায়। ওরাও দোষী হতে পারে। মেয়েকেই-বা বিশ্বাস করি কীভাবে? আর পরীক্ষার পর রক্ত মিলে গেলে যখন গৌতম বিয়ে করতে চাচ্ছে, তাহলে ওকে আগে আগে দোষ দেওয়া যায় না। ওর মনোবল ঠিক আছে বলেই হয়তো সে এ কথা বলছে। রক্ত পরীক্ষাই বলে দেবে কে দোষী।

মিটিং ভেঙে গেলো। আগে সন্তান জন্ম নিক। তারপর রক্ত পরীক্ষা, তারপর বিচার হবে।

তিন মাস যেতে না যেতেই আনন্দ পাল ও ধীরেন পাল পলাতক। কোথাও তাদের খোঁজ নেই। তাদের কোনো চালচুলো নেই। পিছুটান নেই, জমি-জমা নেই। কুমোরের চাক ঘুরিয়ে খায়। যেখানে রাত, সেখানেই কাত। দিনে দিনে প্রকাশ পেলো, তারা ওপারে চলে গেছে। শুরু হলো মুখ শুঁকে চোর ধরার চেষ্টা। ওরা দুজন নিশ্চয় দোষী, নইলে দেশ ছেড়ে পালাবে কেন? এতে গৌতম ঘোষ একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করতে লাগলো।

দিন পেরোতে লাগলো। সন্তান জন্ম নেওয়ার প্রতীক্ষা। এর মধ্যে অমৃত রাণী ঘোষ রাত-চরা বাহিনীকে বশে এনে ফেলেছে। তারাও চুপচাপ। গৌতম ঘোষ সময় একটুও নষ্ট করলো না। জেলা শহরে অফিসসহ বাসা ভাড়া নিলো। গ্রামে আসা প্রায় বন্ধ করে দিলো। ওখানে বসেই আরো কিছু জমি মাকে সাথে নিয়ে বিক্রি করা শুরু করে দিলো। আলেক মাতব্বর বিষয়টা টেনে যত দীর্ঘায়িত করতে পারে ততই সুবিধে। আলেক মাতব্বরের ভাগে সব জমি এলো না। কম দামে আরো কিছু এলো। মুখ তো বন্ধ রাখতে হবে! অন্য কোথাও জমিগুলো ভালো দামে বিক্রি হলো। গ্রাম এলাকা। নীরবে গোছ-গাছের কাজ চলতে থাকলো।

যথাসময়ে মেয়ে সন্তান জন্ম নিলো। মেয়ে সন্তান শুনে শেফালীর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। শেফালী এতদিনে বাস্তবতার নির্মম কশাঘাত একটু একটু বুঝতে পারছে। সন্তানের বয়স একটু বাড়ুক, তারপর রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। জেলা শহরে বসে গৌতম ঘোষ পরিচিতজনদের বলতে লাগলো– মেয়ে ও বাপের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এ দেশে কীভাবে ভিন্ন করানো যায় সে ব্যবস্থা ও কৌশল আমার জানা আছে। আমি পাসপোর্ট ও ভিসার দালালি করে খাই। ইচ্ছে করলে মেয়েকে ছেলে, ছেলেকে মেয়ে বানানোর কৌশলও আমার হাতের মুঠোয়। সুরে সুর মিলিয়ে আলেক মাতব্বর বলতে লাগলো– ও তো সবারই বোঝা হয়ে গেছে, ঘটনাটা কারা ঘটিয়েছে। তাদেরকে আর হাতে পাবে কীভাবে! তারা তো পগার-পার। ভাগ্যিস পালিয়ে বেঁচেছে, নইলে বিচার কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম। আমি বিচারে বাপকেও ছাড়া লোক না। এখন আর রক্ত পরীক্ষা করিয়ে লাভ কী! আচ্ছা, দেখা যাক কী করা যায়। মেয়ে হয়েছে থাক। মেয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবে, জমিগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত গৌতমকে চাপে রাখতে হবে। রক্ত পরীক্ষার সময় এখনো কিছুদিন বাকি।

জুড়োন ঘোষ বিচারের জন্য গ্রামের মানুষ ডাকলে গ্রামের লোকও আসে না, রাত-চরা বাহিনীর লোকজনও আর আসে না। আলেক মাতব্বর অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করতে চায় না। তাই মিটিংয়ে আসে না। মিটিংয়ের দিন আত্মীয় বাড়িতে যাবার হঠাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জুড়োন ঘোষের মাথা থেকে হাত আর নামে না। কেউ কেউ জুড়োন ঘোষকে পরামর্শ দিতে থাকলো মেয়েকে দিয়ে গৌতমের নামে কেস

করানোর জন্য। শেফালী কেসে যেতে নারাজ। তার একই কথা, সে গৌতমকে বিয়ে করবে। কেস দিয়ে সংসার হয় না।

মেয়ের বয়স এক বছর হয়ে গেলো। গৌতম ঘোষের জমি বেচা-বিক্রি শেষের পথে। শোনা যায়, গৌতম ঘোষ ওপারে উল্টোডাঙ্গার পাশে ভালো একটা জমি কিনেছে। এপার-ওপার ঘন ঘন যাতায়াত চলছে। জমিতে দালান উঠোচ্ছে। দিন আসছে দিন যাচ্ছে। জুড়োন ঘোষের দিন যে আর কাটে না। জুড়োন ঘোষ ও শেফালী ঘোষের কোনো একটা সৎগতির কথাই কেবল কারো মাথায় নেই। যার যার কাজে সে সে ব্যস্ত। 'সাঙ্গ হল দড়ির খেলা সবাই গেল চলে, কান হারিয়ে গাধা শুধু ভাসে চোখের জলে।'

অমল ঘোষ একদিন জুড়োন ঘোষের বাড়িতে গেলো। জুড়োন ঘোষের পাশে বসে অনেক সমবেদনা জানালো। কথায় কথায় বললো– জুড়োনদা, তোমার এই বিপদের দিনে কীই-বা এমন সহযোগিতা আমি করতে পারি! আমি ভারতে নিয়মিত যাতায়াত করি, তা তুমি জানো। একটা জিনিস আমার জানা আছে। তুমি বৌদি ও শেফালীর সাথে আলাপ করে দেখো, কাজটা তোমাদের পছন্দ হয় কি-না। এভাবে মেয়েকে নিয়ে আর কতদিন ভুগবা! ভারতে আনেক আশ্রম আছে বলে আমি শুনেছি। তারা সেবাদাসী হিসেবে অনেককে সেখানে আশ্রয় দেয়। মেয়েটা ধর্ম ও সেবার কাজ করে টিকে থাকতে পারবে। শেফালীর মেয়েটাও তার মার কাছে থেকে বড় হতে পারবে। মেয়ে বড় হলে বিয়েশাদির একটা ব্যবস্থা তারাই করে দেবে। মেয়েটা ধর্মকর্ম করে, খেয়ে-পরে ভালোভাবেই দিন কাটাতে পারবে। এভাবে কুলের কলঙ্ক টেনে তুমি আর কতদিন পারবে! তোমার আরো ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে। তাদেরও তো বিয়ে দিতে হবে। তোমরা হ্যাঁ বললে আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারি।

মেয়েটার একটা গতি না করে এভাবে কতদিন আর ঘরে বসিয়ে রাখা যায়! মেয়ে তো এখন কুলের কলঙ্ক। ওর অন্যান্য ভাই-বোনকেও বিয়ে দিতে হবে। ঘরে কলঙ্ক থাকলে তো কেউ ঘরে ঢুকতে চাইবে না। তারচেয়ে অমলের পরামর্শই ভালো। মেয়েটাও আশ্রমে সেবাদাসী হয়ে ধর্মকর্ম করতে পারবে, তার মেয়েটারও একটা ভবিষ্যৎ গতি হবে। অমল ছাড়া দীনের বন্ধু এমন আর কে আছে! 'বড় সঙ্কটে

পড়িয়া দয়াল, বারে বার ডাকি তোমায়, ক্ষম ক্ষম অপরাধ আমায়।' মা শেফালী যদি ঠাকুরের ভক্তি-সেবা করে দিন কাটাতে পারে, সেই-বা মন্দ কী! ঠাকুর, রক্ষা করো! মা-মেয়ে-বাবা সবাই রাজি।

অমল ঘোষ চেষ্টা শুরু করে দিলো। খবর আসতে আরো তিন-চার মাস লেগে গেলো। অমল ঘোষ এ কাজে দালাল ধরেছে। তারা সবকিছুই করে দেবে। অমল ঘোষকে তারা খবর পাঠিয়েছে, মেয়ে ও তার সন্তানকে নিয়ে অমল ঘোষ সামনের মাসের তিন তারিখে বেনাপোল সীমান্তের তিন মাইল উত্তরে সীমান্তবর্তী শান্তিপুর গ্রামে যেন আসে। ওখানে তাদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করা থাকবে।

অমল ঘোষ ও শেফালী তার মেয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিলো। মেয়েকে আশ্রমের প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে জুড়োন ঘোষও সাথে যাবে। শেফালীর মা বার বার জুড়োন ঘোষকে বলে দিলো, আশ্রমের ঠিকানা নিতে যেন ভুল না করে। এক বছর পরেই তারা গিয়ে যাতে মেয়েকে দেখে আসতে পারে।

আশ্রমে যাবার দিন ঠিক হলো। শেফালীর অপরিপক্ক বয়স, মনে অনেক ব্যথা। ভারতে আশ্রমের ঠাকুরকে ভক্তি-সেবা দিতে যাচ্ছে ভেবে ঐদিন ভর সন্ধ্যায় একাকী তেঁতুলতলায় গিয়ে আগে গৌতমকে দেবতাজ্ঞানে পূজার আরতি দিলো। তেঁতুলগাছকে সাক্ষী রেখে অনেক কান্নাকাটি করলো। তার খুব ইচ্ছে করছে যাবার আগে গৌতমকে একবার দেখার। বাড়িতে ফিরে কিছুই খেলো না। এই সময়ে তার মনোব্যথা বোঝার মতো কেউই পাশে নেই। মনটা আবেগে ভরে যাচ্ছে। গৌতমের সাথে হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না। সে বুঝে ফেলেছে তার বিয়ে আর হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে চৌকিতে শুয়ে রেকর্ড করা একটা গান বাজিয়ে শুনতে থাকলো, আর চোখ মুছতে লাগলো:

'ও সুজন বন্ধু রে, আমার যাবার বেলায় নয়ন জলখানি
যদি তোমার মনে না লয় আমি না যেন জানি, ও সুজন বন্ধু রে ...।
বন্ধু রে, ভালো লাগে বইলারে আমি বন্ধু চাই যে মুখের পানে,
যদিও তুমি না চাও ইহা, বন্ধু লোকে না যেন জানে রে পরান বন্ধু

যদি তোমার মনে না লয় আমি না যেন জানি, ও সুজন বন্ধু রে ... ।
বন্ধু রে, তুমি থাকো ফুলের দেশে বন্ধু আছে ফুলের সাথী,
আমার দেশে কেবল ব্যথা, বন্ধু নাইরে ব্যথার ব্যথী রে পরান বন্ধু
যদি তোমার মনে না লয় আমি না যেন জানি, ও সুজন বন্ধু রে ... ।'

এলাকার একজন দালালের সহযোগিতায় ঐ-দিন সন্ধের বেশ পর মাঠের রাস্তা ধরে তারা গ্রাম থেকে রওয়ানা দিলো। ভেঙে ভেঙে শান্তিপুর গ্রামে পৌঁছতে তাদের পরদিন সকাল ন'টা বেজে গেলো। সারাদিন নাওয়া-খাওয়া ও বিশ্রাম। রাতে আশ্রমের প্রতিনিধি সীমান্তে আসবে। শেফালী ও মেয়েকে সাথে নিয়ে সেখানে যেতে হবে।

রাত বারোটা বেজে গেছে। একজন লোকের সাথে শেফালী মেয়েসহ, সাথে অমল ঘোষ ও জুড়োন ঘোষ, গন্তব্যের দিকে হাঁটা ধরলো। খুব বেশি পথ হাঁটতে হলো না। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সীমান্তরেখার এক বাগানের পাশে এসে তারা থামলো। গিয়ে দেখলো আগে থেকেই তিনজন লোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে টর্চ-লাইট। যাবার সাথে সাথে তাদের একজন বাচ্চাটাকে কোলে নিলো। আরেকজন শেফালীর হাত ধরে একটু সামনে জুড়োন ঘোষের অগোচরে নিয়ে গেলো। অন্ধকারে জুড়োন ঘোষের চোখ অতদূর গেলো না। অন্যজন অমলের কাছে এগিয়ে এসে টাকা গোনা শুরু করে দিলো। অন্ধকারের মধ্যে লোক তিনজনের চেহারা ও চলন-বলন দেখে জুড়োন ঘোষের মনটা ভালো লাগলো না। মনে অশুভ শঙ্কা উঁকি দিলো। ততক্ষণে টাকা গোনা শেষ। ঝটপট টাকাগুলো অমল ঘোষের হাতে দিচ্ছে। জুড়োন ঘোষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সহসা বাম হাত দিয়ে বুক ধরে ও ডান হাত কপালে রেখে 'হায় ভগবান' বলে জুড়োন ঘোষ বসে পড়লো। অমল ঘোষ টাকাগুলো জুড়োন ঘোষের পকেটে পুরে দিতে দিতে বলতে লাগলো– জুড়োনদা, তুমি কষ্ট পেয়ো না। তুমি দেখো, শেফালী তার সেবাদাসীর কর্ম দিয়ে তোমার অনেক আগে সগ্‌গে গিয়ে তোমাদের সাথে নেওয়ার জন্য বসে থাকবে। চলো বাড়ি ফিরে যাই।

(পল্লবী, ঢাকা: ০১.০৭.২০২১)

সার্ভিস এজেন্টশিপ

চেনা বামুনের পৈতে লাগে না। আমি সেই ভজানন্দ দেশি। আমার যাযাবর মনোবৃত্তি আপনাদের কাছে অবিদিত নয়। কখন কোথায় থাকি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সমাজে যা ঘটে, নিজ চোখে দেখি, কখনো শুনি– সম্ভব হলে রিপোর্ট করি। আমার একজন শ্রদ্ধেয় গুরু আছেন। এই সব দিনকাল কিছুই বোঝেন না, বুঝতে চানও না। এইসব ঘটনার প্রতি দারুণ এলার্জিক। অগত্যা তাঁর কাছে গিয়ে রিপোর্ট করি; গল্প করি। গুরু আমার কথা মন দিয়ে শোনেন। কখনো আমার দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকেন। চলতি ঘটনার সাথে তাল মিলিয়ে উঠতে পারেন না। কখনো না-বুঝের মতো কিছু একটা বলেন। কখনো অসহায় বিরক্তির ছায়ায় নিষ্কলুষ মুখখানা ঢেকে যায়। কখনো বীতশ্রদ্ধ মেজাজ খারাপ করে গালি-গালাজ করেন। আমার কিছুই বলার থাকে না। নীরব থাকি। শেষে আস্তে করে সরে পড়ি।

সার্ভিস এজেন্টশিপ নিয়ে কথা বলছিলাম। এ দেশের একটা উদীয়মান শিল্প সম্ভাবনা। সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির প্রসার এ দেশে ক্রমশই বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এজেন্টশিপ ব্যবসা। এ ব্যবসার এক প্রান্তে আছে ক্ষমতাবান সুবিধাদাতা, অন্য প্রান্তে আছে মক্কেল, মাঝে এজেন্টশিপ ব্যবসা। 'এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি, মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়। তবুও তোমার আমি পাই ওগো সাড়া, দুটি পাখি দুটি ফুলে গান যেন গায়। মাঝখানে নদী ওই ...।' এ ব্যবসার লক্ষ্যমাত্রা নব্বই ভাগেরও বেশি ইতোমধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে। এ ব্যবসা দেশব্যাপী, পদে পদে, প্রতিটি সেক্টরে, মনোরঞ্জনের মন্দাকিনী তীরে, জীবনের প্রতিটি ঘাটে ঘাটে, পরতে পরতে, জন্মে ও মৃত্যুতে। 'মনমোহিনী কদুর তেল বেচি আর কিনি বন্ধু রে'। ব্যবসাতে তেমন কোনো পুঁজি লাগে না। শুধু একটা দলীয় পদের নাম। কিছু পদধারী ব্যক্তির সাথে ছবি। কখনো কোনো ফটোশপেও এটা করে নেওয়া যায়। সে-সাথে মুখের চোটপাট, দাপট। কথায় কথায় অনেক ক্ষমতাধর লোকের সাথে ফোনে কথা বলার অভিনয়। পিছ পিছ ঘোরা। ব্যবসাতে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর এসবের তেমন আর দরকার পড়ে না। চেনা বামুনের তখন আর পৈতের দরকার হয় না। তখন রতনে রতন চেনে। এ ব্যবসার নাম দালালি ব্যবসা কিংবা তদবির-

বাণিজ্য বলেই এ সমাজে সমধিক পরিচিত। এ ব্যবসা কোথায় কোথায় আছে, তা না খুঁজে– কোথায় নেই সেটাই বলুন? এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। এ ব্যবসা নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা অকপটে গুরুর কাছে রিপোর্ট করতে পারি।

আমার এক পরিচিতজন ওষুধ কোম্পানির মধ্যম পর্যায়ের অফিসার। বড়কর্তাদের কাছের লোক, খুব বিশ্বস্ত। তার কাঁধে দায়িত্ব পড়লো কোম্পানির বিরোধমূলক জমিজমাগুলো ঠিক পথে নেওয়ার। সে উঠেপড়ে লেগে গেল। অফিসে অফিসে লাইনমতো ঘুরতে না পারলে কেউ পাত্তা দেয় না। কোনো টেবিলের সামনে গিয়ে অযথা বসা যায় না। আবার বার বার ধন্না দিয়েও জায়গামতো উপরি না দিতে পারলে কাজ হয় না। এতে ভেজালমুক্ত ও ভেজালযুক্ত কাজে কোনো পার্থক্য নেই। উপরির কমবেশি। এ দেশের দিনকাল নিয়ে আমার পরিচিতজন সজাগ। এজেন্ট ব্যবসায় বর্তমানে লোকেরও অভাব নেই। ব্যবসা জমজমাট। সে সুযোগমতো একজন এজেন্টের সন্ধান পেলো। সবাই তাকে ‘নানা’ বলে ডাকে। এরও একটা অলিখিত নিয়ম তৈরি হয়ে গেছে। চলতি তরিকার শিষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। কোনো কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসের ঠিকানা দিতে পারলে আরো ভালো। স্থানীয় একটা চলনসই পদের নাম থাকতে হয়। মুখটাকে ভালোমতো পালিশ করিয়ে নিতে হয়। খরিদ্দারের সাথে বিনীত ব্যবহার করতে হয়। আবার দামি দামি কথা বলতে হয়।

নানা হলো তিন বছরের জন্য তার সঙ্গের সাথী। নানাকে বললে যে কোনো সময় বাঘের চোখও মিলিয়ে দিতে পারে। বড় কোম্পানির এজেন্ট হয়ে কাজ করেও শান্তি। নানারাও ক্লায়েন্ট বুঝে কেস হাতে নেয়। অফুরান আয়-রোজগার, বেশুমার লেনদেন, আশানুরূপ মার্জিন। তবে কাজ হতে হবে। এজেন্সিশিপ ব্যবসাতে বিশ্বস্ততাও গড়ে উঠেছে। আর মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশ্বস্ততা গড়ে ওঠা ঠিক আছে। ‘তুমভিও কাঁঠাল খাইয়া, আমভিও কাঁঠাল খাইয়া।’ ঢাকার বুকে তিন একর জমি। চাট্টিখানি কথা না। নানার হাতে কমপক্ষে কোটিখানেক টাকার জোগান দিতে হবে। অলিখিত চুক্তি। কিছু কমবেশি হতে পারে। এ দেশের যত রকমের যত অফিসের নামের সাথে জমি শব্দটা যুক্ত আছে সর্বস্তরব্যাপী এর পরিধি। নানা কাগজপত্র সব হালনাগাদ টিপটপ করে দেবে। নানা কোথায় টাকা খরচ করবে

হিসাব পাওয়া যাবে না। তবে কাজ হবে। নানার কাছে সার্ভিস ক্লায়েন্টদের তালিকা আছে। নানা কোথাও ফেল মারেনি। এটাতেও কামিয়াব হবে আশা করা যায়। এটাই নানার সুনাম। 'ফি আমানিল্লাহ' (আল্লাহর নিরাপত্তায়)। হিসাব হবে লাখে। সমস্যা আছে, নানা আছে। সংশ্লিষ্ট অফিসে নানার পরিচিত লোক আছে। এজেন্সির অলিখিত লাইসেন্স আছে। টাকা দিলে মুশকিল আসান আছে। বৈধ- অবৈধতার কোনো বালাই নেই। ফেলো কড়ি, মাখো তেল।

নানাই ভালো জানে কাকে দিয়ে কীভাবে কাজটা করাতে হবে। লেনদেন কত করতে হবে। প্রয়োজনে কাকে দিয়ে ফোন করাতে হবে। ফোনের সম্মানী কত দিতে হবে। এ নানা সেক্রেটারিয়েটের নানা। অধীনস্থ সমস্ত অফিসেও নানার সরব যাতায়াত। এই নানাদের অপেক্ষায় সংশ্লিষ্ট টেবিলের বড়কর্তা লোভাতুর চোখে ধৈর্য ধরে বসে থাকে। টেবিলে নানার সমাদরও আছে। রতনে রতন চেনে। হাতে শুধু এই একটা কাজ নয়, আরো অনেকের অনেক কাজ নিয়ে নানা বিভিন্ন অফিসে ব্যস্ত। নানার মুখ, দলীয় পরিচিতি এবং যথাপরিমাণ উপরি যথোপযুক্ত জায়গায় গছিয়ে দিতে পারার টেকনিক নানার পুঁজি। নানার কাজে আছে পেশাদারিত্বের ছাপ। বর্তমান সমাজে নানার চাহিদা অনেক বেশি। তার প্রয়োজন প্রতিটা পদে, প্রতিটা কাজে, জীবনে-মরণে, দাফনে।

আমার পরিচিতজনও নানাকে সাথে নিয়ে কাজে আনন্দ পেলো। বছর ধরে সন্ধ্যার পরও নানার সাথে বিভিন্ন বাসায় যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। সোৎসাহে তিন বছরের মধ্যে জমির কাগজপত্র সব ঠিক। কিছু জমি বেদখলে ছিল। এলাকার মাস্তানদের বড় নেতাকে পরিমিত পরিমাণ সেলামির মাধ্যমে বিলকুল ঠিক হয়ে গেল। কোম্পানি বেশ কিছু সরকারি জমির মালিক হয়ে গেল। আমার পরিচিতজন কোম্পানিতে প্রমোশন পেলো।

একদিন আমার এসব জানা ঘটনা গুরুকে রিপোর্ট করলাম। গুরু সব সময় কী যেন ভাবেন! অন্যমনস্ক থাকেন। এলোমেলো কথা বলেন। বলেন– বিধাতা উঠিয়ে নাও, আর পারিনে। আমার রিপোর্ট শুনে বললেন– সব কিছু টুকে রাখতে হবে। কোন অফিসের কে কে টাকার কত অংশ হাতিয়েছে, সব বের করে আনতে হবে।

জনসমক্ষে বিচার বসাতে হবে। আবার সেই খুন, একসাথে অনেকগুলো খুন। একটা একটা করে গর্দান দিতে হবে। চাটার দল দেশটা ললিপপের মতো চেটে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে। একজন জেল খাটার কথা, অন্যজনকে দিয়ে জেল খাটাচ্ছে।

গুরুর হুঙ্কার শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। গুরুকে বললাম– এত রাগলে, বেফাঁস কথা বললে হবে কী করে! 'সর্বগায়ে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথা।' 'সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট।'

পরিচিতজনের সাথে দেখা। তার খালাতো ভাই বড় চাকরে। বড় বাহাদুর গংয়ের কুনজরে পড়েছে। ওএসডি হয়ে ঘরে বসে আছে। এমনভাবে বসে থাকলে তো চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাবে! সর্বোচ্চ পদে যেতে আরো তিনটে পদ বাকি। কীভাবে সম্ভব? ছাত্রজীবনে ভালো ছাত্র ছিল। অফিসার হিসাবেও বেশ ভালো। 'কুনজরে পড়লে ক্যামনে ভাই? তুমি কি বাতাস বুঝে ছ্যাপ ফেলতে জানো না?' 'জানি, জানি। প্রতিযোগিতায় ল্যং মারামারি আছে।' আমি পরিচিতজনকে বললাম– নানার কোনো খোঁজ আছে? নানাকে ধরগে যাও, খবর আছে।

নানা আরেকটা কাজ পেলো। অল্প টাকার ভেনচার। আগের কাজের খাতিরে একটা বোনাস কাজ করে দিতে হবে। মাত্র দশ লাখ টাকা দিলেই হবে। আগে বড় বাহাদুর গংয়ের সুনজর কাড়তে হবে; তারপর প্রমোশনের তদবির। তদবিরে ফল দিলো। কোথায় টাকা দিতে হবে, এজেন্ট ব্যবসায় সমিতির প্রধান সহকারী-সাধারণ সম্পাদক নানাই ভালো জানে। খালাতো ভাই সুনজর ফিরে পেলো। দু-বছরের ব্যবধানে পর পর দুটো প্রমোশন হলো। শীর্ষপদে যাবার আগেই বয়স শেষ। সুদৃষ্টি নিয়ে অবসর জীবন। তবু মন্দের ভালো। সুদৃষ্টি ফেরাতে তদবির না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো আর এ দেশে জীবন চলে না! তালে তাল রাখতে হয়, তাল বুঝতে হয়, চিনতে হয়। নানা দীর্ঘজীবী হোক! নানার এজেন্টশিপ টিকে থাক!

আমি গুরুর কাছে গেলাম। বিস্তারিত খুলে বললাম। গুরু বললেন– আবার সেই বিচার, আরেকটা খুন। বিষয়টা গুরুত্বের সাথে টুকে রাখো।

পরিচিতজনের সাথে নানার দহরম-মহরম বেড়ে গেলো। পরিচিতজন নানার মেয়ের সাথে জানাশোনা এক আত্মীয়ের বিয়ের কথাবার্তা চালাতে থাকলো। আমিও বুঝলাম, অনেক পালের গোদা এবার একসাথে হবে। আয়োজন-খানাপিনা বেশুমার হবে। ভোজনের আশাতে থাকলাম। আত্মীয় বললো– বলেন কী! একজন রাজনৈতিক টাউট-দালালের মেয়ের সাথে বিয়ে? এটা হয় না। সমাজটা কি একেবারে ধসে গেছে? পরিচিতজন বললো– হয়, হয়। তোমার বয়স অল্প, রক্ত গরম। জীবনের তাল বোঝো না। সামাজিক বাস্তবতার কিছুই বোঝো না। উন্নতির মই চিনলে না! এটাই এখন হাল ফ্যাশন। তুমি মেয়ের বাপকে টাউট-দালাল বলতে পারো না। সে একটা সার্ভিস এজেন্টশিপ কোম্পানির সম্মানীত চেয়ারম্যান। সমাজে তার কদর আছে, মূল্য আছে, ভালো অবস্থান আছে। দলীয় একটা পদ আছে। সে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে। হাতে প্রচুর লোক আছে, টাকা আছে। এ সমাজে আমরা তাকেই সাধন-ভজন করবো। তুমি একজন নালায়েক ছোকরা। তুমি কাউকে দালাল বলার কে হে?

আবার গুরুর কাছে গেলাম। গুরু বললেন– আচ্ছা, ভজানন্দ দেশি, বলতো কী করি? আমার মেয়েটা বিদেশে লেখাপড়া করতে যেতে চায়। পাসপোর্টের জন্য আজ দু-মাস অফিসে ধরনা দিচ্ছি। অফিসের একজন আমার কাছ থেকে কাজটা করে দেবে বলে ভক্তিভরে সালাম দিয়ে কাজটা নিয়েছিল। আমাকে দেখলেই বলে, 'চাচা মিয়া, আমি আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি। আপনার নিষ্কলুষ মুখ। আমার জন্য মন খুলে দোয়া করবেন। আপনার পাসপোর্ট হয়ে যাবে।' আমি বাসায় এসে প্রতিটা নামাজে তার জন্য দোয়া করি। কিন্তু পাসপোর্ট তো হাতে পাইনে। আর কত দোয়া করতে হবে? বললাম– গুরুমশায়, আপনার বয়স বেশ হয়েছে। আপনি অভিধানে দোয়া শব্দের অর্থ পড়েছেন। এ দেশে দোয়া শব্দের অর্থ আপনি বোঝেন না। না বুঝেই পরপারে যাবার প্রস্তুতি নিন। আপনি অফিসের ঠিকানাটা দিন। কোনো অফিসে দোয়া ও দাওয়া ছাড়া কাজ হয় না। আমি তাকে দোয়া ভালোমতো করে কাজটা আপনার হাতে পৌঁছে দেবো। গুরু বাতাস বোঝে না!

আজকে দেখলাম, আমি রিপোর্ট করার আগেই কে যেন রিপোর্টটা পত্রিকায় করে ফেলেছে। কুয়াকাটা, না ইন্দারাকাটা, কী যেন জায়গাটার নাম। ওখানে যাওয়ার

পথে খালের উপর একটা সেতু। এক অনভিজ্ঞ ঠিকাদার সার্ভিস এজেন্টের মাধ্যমে ঐ সেতু তৈরি করে দেবার জন্য তিন-চার কোটি টাকায় কাজটা হাতে নিয়েছিল। নিজের পকেট, এজেন্টশিপ চার্জ, সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রত্যেক টেবিলে টেবিলে দেওয়া মহার্ঘ, এলাকার সোনার ছেলেদের উৎপাত ঠেকাতে দফায় দফায় বখরা দিতে দিতে বাজেট বরাদ্দের টাকা প্রায় শেষ হয়ে যায়। রড ও সিমেন্ট কেনার ভাগে পড়ে কম। তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ক্যামেরাবন্দি হয়ে সাড়ম্বরে উন্নয়ন ধারার সংবাদ-শিরোনাম হবার আগেই কোমর ভেঙে শুয়ে পড়ে। আর ক'টা দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই পোয়াবারো। রড দিতে না পারলেও রডের পরিবর্তে কিছু বাঁশ কিনে খালের মধ্যে সেতুর কোমরে ঠেকনা দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা অন্তত করিয়ে দিতে পারতো। অনভিজ্ঞ কাকে বলে!

গুরু সংবাদটা শুনে বলে উঠলেন– আবার খুন, কয়েকটা খুন দরকার। গর্দান দিয়ে খুন।

আরেক পরিচিতজনের সাথে দেখা। কোম্পানিতে চাকরি করেন। কোম্পানির মালিকের অন্য ব্যবসার সাথে হাউজিংয়ের ব্যবসা আছে। মালিকপক্ষ কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছে একখণ্ড জমি বিক্রি করেছে অনেকে মিলে বিল্ডিং করে ফ্ল্যাট ভাগ করে নেওয়ার জন্য। কর্মকর্তারা হাতে আকাশের চাঁদ পেয়েছে। জমিটা রেজিস্ট্রির তোড়জোড় হলো। জমি রেজিস্ট্রি তো না, টাকার শ্রাদ্ধ করা। এখানেও এজেন্সি ব্যবসা জমজমাট। জমির মূল্যের ভিত্তিতে টাকা ব্যয় নয়। নির্ধারিত ফি-র তুলনায় কয়েক গুণ বেশি অলিখিত টাকা। দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই। আজব এক জায়গা। যেখানে দরদাম করে যে যা পারছে হাতিয়ে নিচ্ছে। জমি রেজিস্ট্রির পর নাম-পত্তন আরেক বিপদ। আবার সেই এজেন্ট ব্যবসায়ীর হাতে। আবার দরদাম। এতোগুলো নামে জমি কেনা। একটা বইতে এতোগুলো নাম টাইপ করা কি চাট্টিখানি কথা! এবার পরিচিতজনের এজেন্ট ধরতে ভুল হয়েছে। টাকা নেবে। তারপরও ঘুরাতে ঘুরাতে ছয় মাস কেটে গেল। শেষে কর্মকর্তাদের একজন বললো, আমার ধরাধরি করার লোক আছে। টাকা খরচ আছে। তোমরা রাজি থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে করে দিতে পারি। রাজনৈতিক ফোনের মাধ্যমে করতে হবে। এর পরেও টাকা।

সবাই রাজি হলো। সত্যি সত্যি এক সপ্তাহে কাজ শেষ। হাতে কাগজ এসে গেলো। স্থানীয় অফিসে নাম ওঠেনি। উপরতলার কাজ শেষ। লেনদেন নেহায়েত মন্দ না। তবু দিতে হবে। এ দেশে জন্মানোর প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে। প্রায়শ্চিত্ত ফি দেওয়া শেষ।

নাম ওঠাতে গিয়ে স্থানীয় অফিস বেঁকে বসলো, 'যে ওপরওয়ালাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে এনেছেন, তাদেরকে দিয়ে নাম ওঠান। আমি পারবো না নাম ওঠাতে।'

আবার ওপরতলায় গিয়ে জিজ্ঞাসা, 'নীচ তলার অংশ কি আপনারা পাঠাননি?'

–না না, সবাই যার যার অংশ পেয়েছে। নিয়ে যান, কাজ করে দেবে।

–না না, আমি আমার অংশ পাইনি, মাইরি বলছি, পাইনি। আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব না।

–ঠিক আছে, কয়েকটা নাম টাইপ করতে আর একটা রিসিট কেটে দিতে কত খরচ হবে?

–কর্তৃপক্ষের নামে রিসিট দেবো সাড়ে সাতশ টাকার। মোট খরচ হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

–এত টাকা কেন? একটু কমিয়ে বলুন। কাজটা করে দিন।

–ঠিক আছে, দশ হাজার টাকা কম দিন। সব ঠিকঠাক করে দেবো। এর কম হলে মাফ চাই।

–আচ্ছা দেবো। আরো দশ হাজার টাকা কম দেবো। কয়েক দিন ধরে আপনার কাছে ঘুরছি তাই। নইলে পঞ্চাশই দিতাম।

–আচ্ছা কাল এসে কাজটা নিয়ে যাবেন।

সহকর্মীদের পরবর্তী সভায় কর্মকর্তা বললেন– হ্যাঁ, ও-কাজ শেষ। পরবর্তী ধাপে যেতে হবে। শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তো পরিকল্পনা পাস করাতে হবে। অন্য এক কর্মকর্তা বললেন– ওখানেও কাজ করতে দালাল ধরতে হয়। এজেন্টশিপ ব্যবসায়ীর কাছে কাজটা বুঝিয়ে দেবেন, পাওনাটা দেবেন, ছ মাস পর কাজ বুঝে নেবেন। সবাইকে বলে দেওয়া হলো ভালো এজেন্ট খোঁজার জন্য।

কিন্তু নিজেদের মধ্যে তো একটা 'ইন্টারনাল ডিড' করে নিতে হবে। নইলে কলিযুগে মানুষের কথার যে মূল্য, দু দিনেই জিভ উল্টে ফেলবে। আর সবাই তো বেশি লেখাপড়া জানা লোক, 'কেহ নাহি ছাড়ে কারো সমানে সমান'। হাতাহাতি-মারামরি হবে, শেষে মামলা-মকদ্দমা হবে। নিজের তৈরি বিল্ডিংয়ে না বাস করতে পেরে লাল দালানে উঠে বসে থাকতে হবে। তারচে 'ইন্টারনাল ডিড' করে রাখা ভালো। যদি ঘুরে বসে!

এক কর্মকর্তা বললেন– আবার সেই টাকা। আবার এজেন্ট ধরা। আবার উপরি!

–কত খরচ হবে? মোটামুটি আনুমানিক?

–রেজিস্ট্রি ফি আছে সব মিলিয়ে চৌদ্দ হাজার টাকা। দিতে হবে মাথা গুনে কড়ি। মিষ্টি খাওয়া-দৃষ্টি খাওয়া মিলে কমপক্ষে চার লাখ টাকা।

–তবু ভবিষ্যৎ ভালো চাইলে করতে হবে।

পরবর্তী সভায় অনেকেই যার যার মতো অনেক এজেন্টের খোঁজ আনলো। একজন বললো– ডিড করতে চারেরও বেশি লাগবে। কথা দিয়ে এসেছি। এ দেশে কিছু করতে গেলে দিতে হবে। হাজারের হিসাব শেষ, এখন শুধু লাখে।

আরেকজন বললো ভিন্ন কথা। বললো– পরিকল্পনা পাসের কথা বলছি। ঐ প্রতিষ্ঠানের পদে থেকেই অনেকে দালালির ব্যবসা করছে। কেউ কেউ বললো– এদেরকে দিয়েই কাজটা করানো ভালো। খরচ কম হবে। বিশ্বস্ততাও বেশি। বাইরের দালালরা চব্বিশ লাখ টাকা চাচ্ছে। এরা আঠারো লাখে করে দেবে।

–কর্তৃপক্ষের ঘরে কত যাবে, মানে প্রকৃত ফি কত?

–এক লাখ দশ হাজার টাকা।

–তাহলে অনুমতি নিতে এত বেশি টাকা লাগবে কেন?

–শ্যামলা মা-মাটির কোলে জন্ম নিয়ে মহাপাপ করে ফেলেছি। এটা জন্ম প্রায়শ্চিত্ত ফি। এ দেশে কোনো কাজ করে টিকে থাকতে হলে দিতেই হবে। না-হলে তোমার কাজ পড়ে থাকবে।

–আমাদের জমিতে তো কোনো ভেজাল নেই। তাহলে প্রায়শ্চিত্ত ফি এতো কেন?

–ভেজাল নেই বলেই তো রক্ষে। নইলে ফিয়ের পরিমাণ পঞ্চাশ লাখে ঠেকতো। তবে কাজ হতো।

–অফিসে বেতনভোগী সাহেবরা বসে আছে কেন?

–ফি ধরার জন্য।

একজন কর্মকর্তা বললো– তাহলে আর বাড়ি না করি?

–এটা তোমাদের ব্যাপার। তারা তো তোমার বাড়ি করার জন্য তোষামোদ করতে আসছে না। তুমি তাদের কাছে অনুমতি নিতে যাচ্ছ কেন? ওরা বসে আছেই তো টাকা ধরার জন্য। এছাড়া ওদের অন্য কোনো কাজ নেই। আর অন্য কাজ নেই বলেই তো নিজেরাই দালালি ব্যবসা ধরেছে। এ মগের মুল্লুকে জন্মাবে, আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবা না, তা কী করে হয়?

একজন কর্মকর্তা বললো– বেশি বাড়তি কথা বোলো না, দেশদ্রোহী বলে তোমার নামে হুলিয়া জারি হয়ে যাবে। তারচে বাড়ি করলে করো, যেখানে যা লাগে দাও, না-হলে বাদ দাও। সবাইকে ডুবিও না। আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ইচ্ছে নেই। বিবি-বাচ্চা-সংসার আছে।

বেশি করে রিপোর্ট করার জন্য পরিচিতজন আমাকে বললো। আমি বললাম– এত রিপোর্ট তো পত্রিকার পৃষ্ঠাতে কুলাবে না। আমাদের কান ও চোখ তো রিপোর্ট-প্রুফ হয়ে গেছে। রিপোর্টে কি আসে-যায়! আরো বললাম– 'আকাশবাণী কোলকাতা'র একটা গান ছোটবেলায় শুনেছিলাম, 'গোউরকে ডেকে বলছে সুবোল, ব-অ-ল, আনিস না আর ইঁদুর মারা কল'।

ভাবলাম– পত্রিকায় না-হোক, গুরুকে গিয়ে রিপোর্টটা করি।

সব শুনে গুরু বললেন– পুরোটাই রিপোর্ট করে রাখো। আবার সবগুলোকে খুন। গর্দান দিয়ে খুন। ওরা সাধারণ মানুষকে খুন করছে। খুনের বদলা খুন।

বাড়ি থেকে বোন ফোন করে বলছে, তোর ভাগ্নেটা তো এইচএসসি পাস করে বেকার বসে আছে। চাকরি দেওয়ার জন্য এজেন্টরা ঘুরছে। পিয়ন পদে চাকরি

নিতে আট লাখ টাকা নগদ দিতে হবে। টাকা না হয় জমি বেচে দিলাম, কিন্তু ঐ এজেন্টের নিশ্চয়তা কে দেবে যে কাজটা ঠিকমতো হবে। এ সমাজে যে এজেন্ট ও টাকা ছাড়া কিছুই হচ্ছে না, তা ঐ বদ্ধ পাগল ছলিমও জানে।

এই তো গতবার স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের কথা। এখন নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হচ্ছে। রাজনীতি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে গিয়ে কেউ শোবার ঘরের দোরগোড়ায়, কেউ রান্নাঘরের দোরগোড়ায়, কেউবা টয়লেটের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়েছে। দুর্গন্ধে স্থানীয় আকাশ-বাতাস ভরপুর। আমাদের পাশের গ্রামের টাউট মফিজ থানা ও জেলা পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের ধামাধরা হয়ে পিছ পিছ বেড়িয়ে কমপক্ষে কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে। আমার সাথে একদিন চলতি পথে দেখা। আমাকে বললো– ভজানন্দ দেশি, আমার সাথে পারলে আজ সন্ধ্যায় একটু দেখা কোরো তো। অনেক আলাপ আছে। তুমি তো এদিক-ওদিক বিভিন্ন জায়গায় বেড়াও। তোমার অনেক বুদ্ধি আছে। আমাকে পরামর্শ দিতে হবে। আমার হয়ে কাজ করতে হবে। আমি এ এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে চাই।

–কী বলতে চান, সময় থাকলে এখনই বলুন। দুজনে পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়ালাম।

–আমি এ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হতে চাই। কী করতে হবে বলো?

–পথ তো একটাই আছে, যেটা আপনার আমার সবারই জানা। আপনার ঐ পদ থেকে দেশের অনেক উচ্চপদ পর্যন্ত একই তরিকা। তরিকা মোতাবেক কর্ম শুরু করে দিন। আপনি নিজেও এসব ভালোই জানেন। জেলার নেতার মন জয় করার জন্য প্রথমেই একটা লবিস্ট নিয়োগ দিন। তারপর ...।

–লবিস্ট আবার কী?

–লবিস্ট মানে সার্ভিস এজেন্ট, জেলার নেতার সাথে যে ব্যক্তি লেনদেনটা আপনার হয়ে করবে। সোজা কথা আপনার পক্ষ হয়ে দালালি করবে। জেলার নেতা আপনার যত ঘনিষ্ঠই হোক, আপনি তো আর সব সময় তার সাথে চাহিদামতো দেনা-পাওনা মেটাতে পারবেন না। অভিধানে লজ্জা-শরম বলে তো একটা কথা এখনো আছে, না কি? অন্যরাও আপনার মতো প্রার্থী হতে চাইবে। এখানেও প্রতিযোগিতা। মাল-

মশলা ঢালার প্রতিযোগিতা। আপনাকে এগিয়ে থাকতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকলে নেতা আপনার হয়ে অনেক কাজ করে দেবে। আপনার সাথে ওয়ার্ডভিত্তিক মিটিংয়ে যাবে। মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে আপনার হাত ধরে উঁচু করিয়ে উপস্থিত সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এলাকায় তার যত চাটার দল তখন আপনার সাথেই থাকবে। তারা সব আপনার হয়ে যাবে। আপনাকে চাটতে চাইবে। হাত উঁচুর সাথে সাথে তারা জোর করতালি দেবে। এখানে তো আর নীতি-আদর্শের কোনো বালাই নেই। আছে চাটাচাটি আর দল বেঁধে পালে চলা, স্লোগান দেওয়া। চাটার দলকেও খরচপাতি করে আপনাকেই সামলাতে হবে। প্রতিটি গ্রামে আপনার কর্মীবাহিনী তৈরি করতে হবে। সবাই টাকার গন্ধে আপনার পিছ পিছ ঘুরবে। চার ছিটিয়ে মাছ জড়ো করা যায়, টাকা ছিটিয়ে চাটার দল। আপনি যেহেতু একই তরিকায় কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, এ পথ আপনার অতি চেনা-জানা। তবু আমাকে সাথে ধরে রাখার জন্য না-জানার ভাব ধরেছেন। আপনি দৈনিক পত্রিকাটা কমপক্ষে ছয় মাস একটানা চোখ মেলে পড়বেন। আপনার ট্রেইনিংয়ের ঘাটতিটুকু পূরণ হয়ে যাবে। এবার আপনি কত টাকা এ পদের জন্য বিনিয়োগ করতে চাচ্ছেন, তাই বলুন?

—খুব বেশি পারবো না। কোটি খানেক তো বটেই। এর কম হলে পাস করে বেরিয়ে আসা যাবে বলে মনে হয় না। এটা আমার একটা রাফ এস্টিমেট। আবার টাকাটা পানিতে পড়ার ভয়ও তো রয়ে গেছে।

—কোনো বিনিয়োগ বৃথা যায় না। কোনো-না-কোনোভাবে এ থেকে লাভবান আপনি হতে পারবেন। আর ব্যবসা মানেই তো কিছু লাভ-লোকসান থাকবেই। আপনার নিজের গুণগান নিজে গাইলে তো হবে না। অন্যের মুখ দিয়ে গাওয়াতে হবে। যতক্ষণ কেউ না গাইবে, মুখের মধ্যে চার ঢালতে হবে। প্রতিটা পাড়ায়-মহল্লায় যে চাটার দল তৈরি হয়েছে, তারাই কেবল আপনার চার চাটতে আসবে। সাথে দলীয় মেম্বর পদপ্রার্থীদেরও পাবেন। তাদেরকেও সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। সেখানেও একই দলের বিদ্রোহী প্রার্থী থাকবে। সবারই তো উদ্দেশ্য একটাই— এলাকার উন্নয়ন। তা আপনি আপনার বিনিয়োগ কীভাবে ফেরত পাবার ইচ্ছে করছেন?

–তুমি রিপোর্টার মানুষ, সবকিছু বোঝো। তোমার কাছে আর লুকোচুরির কী আছে! এবারই তো আমার নতুন। আশা করছি, পাঁচ বছরে দশ কোটি টাকা লাভে-মূলে ঘরে তুলতে পারবো। উন্নয়নের টাকা চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু ধামাধরাদের সাথে নিয়ে, আর একটা বড় ধামা নিয়ে কুড়ানোর কাজে নেমে পড়া দরকার। আর একটা লাইসেন্স দরকার। এই লাইসেন্স সংগ্রহের জন্যই-না এতো চেষ্টা। কোনো-না-কোনো একটা চলনসই পদ থাকা জরুরি। আমাদের সম্মানীত নেতা-নেত্রীরা ইচ্ছে করলেই আরো আরো অনেক পদ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। আমরা পদস্বল্পতায় ভুগছি।

–উন্নয়নের টাকা ছাড়াও সাধারণ মানুয়ের কাছ থেকে আদায় করার টাকাও তো কম নয়।

–শুধু সাধারণ মানুষের থেকেই না। যত বিপদ-আপদ, বিচার-আচার, আচার-অনুষ্ঠান পালন, রকমারি বাজার, সবই টাকার খেলা। টাকা আর টাকা। ঐ-যে কী যেন নতুন একটা শব্দ তুমি বললে, মনে করতে পারছিনে?

–লবিস্ট, লবিস্ট।

–হ্যাঁ, শব্দটা পরিচিত না, কিন্তু কাজটা অতি পরিচিত। সার্ভিস এজেন্ট। এসব কাজ তো আমাকে দিয়ে কেউ করাচ্ছে, আবার আমিও কাউকে না কাউকে দিয়ে করাচ্ছি। আমরা তো এ ব্যবসাতেই আছি।

–মফিজ ভাইজান, তাহলে আমি আসি। আপনার দিন আরো শুভ হোক।

বেশ কিছুদিন পর গুরুর সাথে দেখা করতে এলাম। গুরু আমার রিপোর্ট শুনে অগ্নিশর্মা রূপ ধারণ করলেন। বললেন– ভজানন্দ দেশি, আমার খুব সর্দি-জ্বর ও কাশি, তোমরা কি দেশের সর্বনাশী? বলতে লাগলেন– আবার বিচার, আবার খুন, আরো খুন, খুনই এদের উচিত প্রাপ্য।

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অবশেষে বললাম– গুরু, খুন করে করে মানুষই তো সব শেষ করে ফেললেন। 'ঠগ বাছতে গা উজাড়' অবস্থা। নির্বাসন কিংবা তেপান্তরে পাঠানো যায় না?

পরদিন সকালে উঠে বাইরে বেরোতেই এক লোকের সাথে পরিচয় হলো। শিক্ষা নিয়ে থাকে। শুনতে বেশ ভালই লাগলো। ভক্তিতে মাথাটা অবনত হলো। কথায় কথায় তার অফিসে গেলাম। কোচিং সেন্টারের ব্যবসা। স্বভাবমতো অনেক তথ্য নিতে থাকলাম, কোনো কিছুই চোখ এড়ালো না। তার মনে অনেক কষ্ট। অনেক চেষ্টার পরও পর্যাপ্ত টাকার অভাবে ও দুর্বিপাকে কোচিং সেন্টারটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে এতদিনেও পারেনি। তাই এখনো বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবসার সহযোগী হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। কোচিং ব্যবসার সাথে ছাত্রছাত্রী সরবরাহের এজেন্টশিপ আছে। কয়েকটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য। কোচিং দিতে দিতে ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা। ছাত্রপ্রতি বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ হাজার টাকা দালালি দেয়। দালালি শব্দটা ব্যবহার না করে সবাই বলে কমিশন। এটাও সার্ভিস এজেন্টশিপ। এতে অনেক টাকা আয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এভাবে ছাত্রছাত্রী জোগাড় করছে। প্রতিষ্ঠান কানায় কানায় পূর্ণ। 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত।' আবার ভর্তি-হওয়া ছাত্র যদি নিজ চেষ্টায় আরো ছাত্রছাত্রীকে এনে ওখানে ভর্তি করাতে পারে, মাথাপ্রতি সেও পাঁচ হাজার টাকা পাবে। সুযোগ ভালো। আয় করো আর সনদপত্র নেবার প্রস্তুতি নিতে থাকো। না পড়ে সনদপত্র নেওয়ার ব্যবসাও এ সমাজে রমরমা-জমজমাট। লেখাপড়ার ঝামেলা এড়িয়ে সনদপত্র পাওয়ার খরিদ্দারের অভাব নেই। শিখতে চাওয়া ছাত্রছাত্রীর বড্ড আকাল। ওপেন-মার্কেট ইকোনোমি। চাহিদা আছে, জোগানদাতাও আছে। ব্যবসা আছে, বুদ্ধি আছে, এজেন্টও আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফিও অপেক্ষাকৃত কম। দেশসেবায় নিয়োজিত। শিক্ষক নিয়োগেও নির্দিষ্ট মান দরকার নেই। ছাত্রদের পরীক্ষা পাসে সহযোগিতা করাই শিক্ষকদের মুখ্য দায়িত্ব। এখানে শিক্ষকরাও সনদ-কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝখানের এজেন্ট। শেখানোর প্রয়োজন না হলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকেরই-বা দরকার কী? নোট তৈরি করে দেবার যোগ্যতা থাকলেই হলো। বেকারত্বের যুগে অল্প বেতনে শিক্ষক পাওয়া কঠিন কিছু না। সনদপত্র পেতে শিক্ষককে আবার ছাত্রছাত্রী পড়ানো লাগে নাকি! অলিখিত নিয়ম। ছাত্রছাত্রী সেই ছোটবেলা থেকে নোট-বই মুখস্থ করে করে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রতিটা ক্লাস পেরিয়ে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে। এ অভ্যাসকে কাজে লাগাতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার অহেতুক ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে প্রতিটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বই থেকে

সর্বোচ্চ ছয়টা ছোট ছোট নোট তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেবেন। নোট মুখস্থরও দরকার নেই। উত্তরপত্রে বসিয়ে দিতে হবে। শিক্ষকদের আর একটা অবশ্যপালনীয় কাজ হলো, ছাত্রছাত্রীরা নোটগুলো পরীক্ষার খাতায় উঠানোর পর ভালো মানের একটা গ্রেড দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নম্বরপত্র যথাযথভাবে জমা দেওয়া। কর্তৃপক্ষ বছরে দু বার ভালো চকচকে দামী কাগজে সনদপত্র ছাপিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সদম্ভ বক্তৃতার সাথে সাথে সনদপত্র বিলাবে। টিভির দামি ক্যামেরা ও হরেক রকমের গণ-ক্যামেরার এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি চলবে। বিভিন্ন কৌণিক ভঙ্গিতে ছবি নেবে। শিক্ষার উন্নয়নে এ দেশ মহাব্যস্ত– কথাটা ফলাও করে পত্রিকায় আসতে হবে। এতিম শিক্ষাঙ্গনের পর্দানশীন খেলা চলবে হরদম।

কোচিং সেন্টারের ভদ্রলোক তার দুর্বিপাকের কথাগুলো অকপটে খুলে বললেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পাওয়ার জন্য কাগজপত্র তৈরি করিয়েছিলাম। ডাকসাইটে ক্ষমতাধর এজেন্ট ধরেছিলাম, বর্তমান ক্ষমতার হর্তাকর্তা। তিনি কথা দিয়েছিলেন, যেভাবেই হোক শেষ নামিয়ে দেবেন। সমস্ত ফি জমা দেবার পরও স্পিডমানি হিসেবেই দিয়েছিলাম ছয় কোটির মতো। কাজও যথাযথভাবে এগোচ্ছিল। ইন্সপেকশন, রিপোর্ট সব হয়ে গিয়েছিল। বিল্ডিং ভাড়াও নিয়েছিলাম। আর দুটো ধাপ বাকি ছিল। এজেন্টের জেলাতে সতীর্থ পৌর কমিশনের চেয়ারম্যান খুন হলো। দলীয়ভাবে দায়ভার আমাদের এই এজেন্টের কাঁধে এসে পড়লো। তিনিও তেমনটা সামাল দিতে পারলেন না। অভ্যন্তরীণ কোন্দল আমাদের জানার কথা না। পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হলো। তিনি কোণঠাসা হয়ে গেলেন। এ দেশে কোনো নেতার উত্থান-পতন কখন কীভাবে হয় বলা শক্ত। তার ক্ষমতা খর্ব হলো। জেল-ফাঁসি হলো না বটে, ক্ষমতার দাপট কমে গেলো। কেন্দ্র থেকে পদহারা হলেন। আমাদের কাজের গতিও ধীর হয়ে এলো। এসব টাকাও তো কোনোদিন ফেরত পাওয়া যায় না। আমি ও আমার পার্টনার নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আশা পূর্ণ হলো না। হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলাম। পরে অবশ্য বড় একটা অফিস থেকে ফোন পেয়েছিলাম, ফাইলটা সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই কি-না? এ দেশে এজেন্টের অভাব নেই। আমার পার্টনারের সাথে বসে পরামর্শ করলাম। অফিস থেকে আবার মোটা অঙ্কের টাকা চায়। চার কোটির কাছে। এ পরিমাণ টাকা জোগানো আর সম্ভব ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসার লাভ-লোকসানও তো ভাবতে হবে। অগণিত ব্যবসায়ী হওয়াতে এমনিতে শিক্ষার বাজার মন্দা। আমাদের কোমরও আগেই ভেঙে গিয়েছিল। অবৈধ প্রতিযোগিতার বাজারেও ভাগ্য বলতে একটা কথা আছে, আমরা যেটাকে বলি, 'স্টার ফেভার' করা। আমি যেদিকে যাই, কপাল সাথে সাথে যায়। আমরা ভাগ্যদোষে দৌড়ে হেরে গেছি। আমার পার্টনার আমাকে বলেছিল, আমি যেন ঐ অফিসের নতুন এজেন্টকে বলে দিই– 'আমার আশার বাসা ভেঙ্গে গেছে সখী, আমার আশা আর করো না।' সে থেকে কাউকে বলতেও না পারি, সইতেও না পারি। তাই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির দালালি করে বর্তমানে টিকে আছি।

গুরুর কাছে গেলাম না। শিক্ষা নিয়ে তেলেসমাতি কারবার শুনলে গুরু অগ্নিমূর্তি ধারণ করবেন। গুরুর মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন হবে। রাগে-ক্ষোভে গুরু আত্মহত্যাও করে বসতে পারেন। তখন সে আবার এক বাড়তি ল্যাঠা। আমার জেলে যাবার ভয়।

সন্ধ্যার কালো ছায়া নেমে এসেছে। আবছা আলোয় মানুষগুলোর মুখ একেবারে কাছে না গেলে চেনা যাচ্ছে না। কালো ছায়া দেখেছি গুরুর মুখমণ্ডলে, আমার মনেও। প্রশস্ত বড় রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে হনহন করে হাঁটছি। কিছু দূরে রাস্তা পাহারায় নিয়োজিত টহল দল ভ্যান গাড়িতে বসা। একজন লোককে দেখলাম, পথের ধারে দাঁড়িয়ে ডিম বিক্রির দোকান, বাদাম বিক্রির দোকান, ঝালমুড়ি বেচার দোকান, এমনই হরেক রকমের দোকান থেকে টাকা উঠাচ্ছে। সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলাম– কীসের টাকা উঠাচ্ছেন ভাই?

লোকটা আমার দিকে গরম নজরে দাঁত কটমট করে তাকালো। বুঝলাম, পিছনে শক্তি আছে। উত্তর না দিয়ে পাল্টা আমাকেই প্রশ্ন করলো– আপনি কে?

বললাম– আমি রিপোর্টার। লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেলো। সুযোগটা আমি নিলাম। আবার বললাম– আমার কথার উত্তর দিলেন না তো?

–আমি স্যারদের এজেন্ট হয়ে কাজ করি। আমার কাজই হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ফুটপাথের দোকানে দোকানে গিয়ে বখরা উঠানো। এজেন্টের ব্যবসা।

–দোকানপ্রতি আপনার ভাগে কত পড়ে?

–মাত্র বিশ টাকা। বাকিটা স্যারদের দিতে হয়।

–দোকানপ্রতি কত আসে?

–পঞ্চাশ থেকে একশ টাকা।

–মাথাপ্রতি এই অল্প রোজগারে আপনার ও আপনার স্যারদের বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হবার সম্ভাবনা কতটুকু?

–আমাদের টার্গেট যুগ-যুগান্তর পর্যন্ত।

–আমার এত ধৈর্য নেই।

–রোজগারটাকে এতো ছোট করে দেখছেন কেন? বুঝি, রিপোর্টার ক্ষুদ্র কারবারি। মনটা ছোট। দোকানের সংখ্যা তো কম না। হাজারে হাজার। আবার পৌনঃপৌনিক রোজগার। মাসভিত্তিক না, বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। রাই কুড়িয়ে বেল, বেল কুড়িয়ে তাল। আবার অগুনতি তালের বিশাল সমাহার।

–কোনো দোকানি ফি না দিয়ে পালালে?

–আগামীকাল বসতেই দেবো না। গরজ বড় বালাই। পেটের দায়ে ওদের কোথাও না কোথাও বসতেই হবে।

–হ্যাঁ, আমিও বুঝি। ওরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে এভাবে জন্ম-প্রায়শ্চিত্ত ফি দিয়ে টিকে আছে।

–হ্যাঁ, ওদের কাছ থেকে এলাকার রাজনৈতিক মাস্তানরাও সম্মানী নেয়। এটাও ওদের একটা রোজগারের উৎস। ওদের টাকা উঠানো শেষ হলে পরে আমরা উঠাই। ভাইজান, আপনাকে কত দিতে হবে?

–না, আমি ঐ রিপোর্টার না। আমার এক গুরু আছেন। আমি তাঁর কাছে রিপোর্ট করি। আপনার এজেন্সির অফিসটা কোথায়?

–আমার কোনো অফিস-টপিস নেই। আমি মুক্ত-স্বাধীন এজেন্ট। স্যারদের পিছ পিছ ঘুরি। রাতে এক-মাথা স্বপ্ন নিয়ে খুপরিতে গিয়ে ঘুমাই।

–স্বপ্ন আবার কীসের? কোনো পদে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন নাকি?

–উন্নতির তরিকা আমার চেনাজানা। এখন কাজে খাটানো বাকি।

আমার এক বন্ধুবর এজেন্ট আছে। তার হাতে টাকাওয়ালা বণিক-মহাজন, রাজনীতিক, মাফিয়া আছে। তারা রমণীয় সেবায় তৃপ্তি পেতে চায়, টাকা-পয়সা উড়াতে চায়। মনোরঞ্জনের জন্য মধুবন চায়। জরুরি প্রয়োজন। আমার হাতে মধুবনেরও এজেন্ট আছে। উন্মুক্ত বাজার– চাহিদা আছে, জোগান আছে। তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মধুবনের এজেন্ট রঙ্গালয়ের প্রমীলাকে সুরে সুরে বললো, 'আয় প্রমীলা, বয়লো কাছে আর একটি কথা শোন, তোর ঘাটেতে বসে আছে এক নবীন মহাজ-ও-ও-ন, তারে নি তুই দিতে পারিস তোর সোনার যৌবন, বন্ধু রে?' 'প্রমীলা কয়, বণিক তোমার নৌকায় আছে কী?' 'বণিক বলে, মনোহারী মাল আলতা চিরুনি-ই-ই, স্নো-পাউডার, কপালের টিপ, আঁচলা-চন্দনি, বন্ধু রে। রঙ-বেরঙয়ের চুলের ফিতা, খোপায়-চিরুনি, গায়ে-মাখা খোশবু-সাবান তিব্বত কোম্পানি-ই-ই, নেশার রসদ, বন্দুক-সিন্দুক বেচি আর কিনি, বন্ধু রে।' যোগাযোগ সুদৃঢ় হলো। লেনদেন পাকাপোক্ত হলো। যাওয়া আসা শুরু হলো। মধু-লীলা রমরমা হলো। আমি দেখে মুচকি হাসলাম। এ দেশে জন্ম আমার সার্থক হলো।

অনেক দিন থেকে আমার আর গুরুর সাথে দেখা করতে যাওয়া হচ্ছে না। এ দেশে এজেন্টশিপ ব্যবসার রকমফের ও ব্যাপ্তি দেখে দিনে দিনে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। মাথায় কোনো কাজ করছে না। গুরুর মতো আমারও মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রাতে শুয়ে সার্ভিস এজেন্টশিপের কথা মনে হতেই ছোটবেলায় শোনা একটা গল্প এতদিন পর স্মৃতির জানালায় উঁকি দিলো। নিজেকে ফাঁকি না দিয়ে গল্পটা পুরোটাই ভাবলাম:

আমাদের গ্রাম থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে প্রতি সপ্তায় গো-হাট বসে। গ্রামের এক সাধারণ চাষি গেছে গরু কিনতে। ইচ্ছে, একটা এঁড়ে গরু কিনে এই আষাঢ়ে ভালোমতো কাঁচাঘাস খাইয়ে বড় করবে। ভালো করে চাষবাস করে বেশি বেশি ফসল ফলাবে। হাটে দালালদের ছদ্মবেশী ভিড়। কে বিক্রেতা, কে প্রকৃত ক্রেতা চেনা খুব কঠিন। তার অজান্তেই এক দালাল একটা ভালো তেজি গরু তাকে গছিয়ে দিয়েছে। চাষি গরু কিনতে পেরে মহাখুশি। তাড়াতাড়ি বেলায় বেলায় বাড়ির পথ ধরেছে। বাড়িতে ফিরতে বেশ রাত। পনেরো কিলোমিটার হেঁটে এসে সে খুব ক্লান্ত। উঠোনে গরু বেঁধে রেখে হারিকেন সামনে নিয়ে ঘরের পিঁড়েয় তাড়াতাড়ি খেতে

বসেছে। নিজে খেয়েই গরুটাকে খেতে দিয়ে শুয়ে পড়বে। ভাত খাচ্ছে আর গরুর দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ গরুটা চুনানো শুরু করলো। লোকটা তাড়াতাড়ি হারিকেনটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে নেমে গরুর কাছে এলো। হারিকেনটা চোখের কাছে নিয়ে চোখ দুটো মোটা-মোটা করে একবার গরুটার পেটের নীচে ও একবার পেছনের দিকে তাজ্জব হয়ে তাকাচ্ছে। সে দেখছে, গরুটা চুনানোর কথা পেটের নীচে, অথচ পেছনের দিকে চুনাচ্ছে। লোকটা মোটা-মোটা চোখদুটো মেলে দালালের আর গরুর কর্মকে মেলাচ্ছে– হারিকেনটা একবার মাঝে, একবার পিছনে নিচ্ছে। বিক্রেতা বলেছিল কী, আর হচ্ছেটা কী! গরুটা চুনাবে কোথায়, আর চুনাচ্ছে কোথায়! চোখ দিয়ে মাপতে চেষ্টা করছে, কতটুকু ফারাক!

পরদিন গুরুর কাছে এলাম। সবিস্তারে রিপোর্ট করলাম। গুরু আজ আর মুখস্ত মতো 'খুন' 'খুন' বলতে লাগলেন না। বললেন– ওদের আর খুন না, খুনে খুনে দেশই শেষ। ওরা কেউ কেউ খেটে-খাওয়া মানুষ। সব টুকে রাখো। ওরা মরে গেলে ওদের সংসার চালাবে কে! সর্বত্র লেজে-গোবরে অবস্থা। এখানে অন্য চিকিৎসা, পাদুকা-চূর্ণ প্রলেপ দিতে হবে। প্রত্যেকেরই পরিচয়পত্র সদা-সর্বদা সাথে রাখতে হবে। পরিচয়পত্রটা আরেকটু বড় হতে হবে। তারিখ সহকারে লিখে রাখার মতো জায়গা থাকতে হবে। তার প্রতিটা অপরাধ সেখানে টুকে রাখতে হবে। অপকর্মের ন্যায্য বিচার জন-আদালতে করতে হবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম– পরিচয়পত্রে টুকে রাখার মতো আইনের লোকটা কোথায়? সেখানেও তো এজেন্সি ফিয়ের ব্যাপার!

গুরু জোর দিয়ে বললেন– তাও আমি জানি। আমি তো অসহায়! আমি সাধারণ মানুষ। আমি খুনি না। গর্দান দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই। সবই আমার ইচ্ছে করে, সবই আমার ইচ্ছে করে। সুর করে গাইলেন– 'আমি যা চেলাম তা পেলাম কই! তুমি কেন মজালে সই বাজারে এনে।'

(পল্লবী, ঢাকা: ৩১.০৭.২০২১)

জীবন যেখানে যেমন: কোভিড-১৯

সালেহীন মাস্টার আসরের নামাজের পর বাংলা কোরান শরিফের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছেন। দেশের সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে ভাবছেন। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, মূর্খতা, বোধশক্তিহীনতা নিয়ে চিন্তা করছেন। নিজের এলাকার অবস্থার খোঁজখবর বিভিন্নজনকে ফোন করে জানছেন, আর পরিণতির কথা ভেবে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। পাঁচ দিন পর ঈদ, কিন্তু ঈদের আনন্দ, কেনাকাটা, কোরবানির বিষয়গুলো এবার চলতি পথের কোন অজানায় যেন হারিয়ে গেছে। গত ঈদও এভাবেই কেটেছে। তখন করোনার প্রতাপ ছিল শহরে বেশি, গ্রামে খুবই কম। আবার ধরন ছিল সহনীয় পর্যায়ে। তাও অসংখ্য লোক মারা গেছে। সব খবর জানা যায়নি। মোবাইল ফোনের কারণে অনেকটাই বোঝা গেছে। এবার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হতেই ডেল্টা ধরন পরীক্ষায় বেশি পাওয়া যাচ্ছে, যা অনেক অনেক মারাত্মক। গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষাহীনতার কারণে বিপদ বেশি। অজ্ঞতা ও বেশি-বুঝি ভাবের কারণে নিজের অজান্তেই যারপরনাই ভোগে, অথচ আত্ম-সচেতনতা ফিরে আসে না। পরিণামে পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজেও মরে, অন্যকেও মারে।

একটা আয়াতের দিকে সালেহীন মাস্টারের চোখ আটকে গেল। ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই-সব বধির ও বোবা, যারা কমন সেন্স (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান/বোধশক্তি)-কে কাজে লাগায় না –৮:২২।’ কথাটা পড়ে সালেহীন মাস্টার চমকে উঠলেন। একটু পরে গ্রামের এক কাছের মানুষকে ফোন করলেন। ঢাকায় বসে সব এলাকার তাৎক্ষণিক খোঁজখবর নেওয়ার একমাত্র মাধ্যম এই মোবাইল ফোন।

তাঁর গ্রামের বাড়ি ঢাকা থেকে কমপক্ষে তিনশ কিলোমিটার দূরে, ভারতের সীমান্ত এলাকায়। বাড়ি থেকে সীমান্তের দূরত্ব মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার। তিনি ফোন করা শুরু করলে একাধিক জনের কাছে ফোন করেন, নতুন নতুন খবর পাবার জন্য, আবার কখনো খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য।

–হ্যালো, তোমরা সবাই কেমন আছো? এলাকার পরিস্থিতি কেমন যাচ্ছে?

–না, ভালো না। ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। মানুষ বুঝতে চাচ্ছে না। কোনো বাধা মানছে না। ভারতীয় এলাকায় গরুর ব্যবসায়ী ও চুলের ব্যবসায়ী রোগটা ওপার থেকে এপারে বেশি আনছে। ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া রোগীদের না পুড়িয়ে অনেক সময় নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এ দেশের কেউ কেউ টাকার লোভে লাশের ঐ চুল সংগ্রহের জন্য নদীতে নামছে। চুলের ব্যবসা করছে। কোনো বাছবিচার না করে নিজের পরিবারের সাথে মিশছে। দোকানে বসে সাধারণ মানুষের সাথে মিশছে, দোকানে বসে চা খাচ্ছে। রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ক্রমশই আক্রান্ত হচ্ছে। গরুর দালালদের মাধ্যমেও রোগ ছড়াচ্ছে। মানুষকে যতই সতর্ক করা হোক না কেন, মাস্ক ছাড়া পথেঘাটে চলাফেরা করছে। হাটে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে দোকানে কেনাকাটা করছে। আর্মি-ম্যাজিস্ট্রেট দেখলে দল বেঁধে দৌড়ে পালাচ্ছে। একটু পরে ফিরে গিয়ে আবার আগের অবস্থায় থাকছে।

–তোমরা কী করছো? নিজের আশপাশের লোকজনকে সাবধান করো। নিজে সাবধান থাকো।

–আমরা চেষ্টা করছি। অধিকাংশ লোক আমাদের কথা শুনছে না। বরং উল্টো কটুক্তি করছে। কেউ কেউ আমাদের কথাকে হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছে। এখনই যদি রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে যাই, দেখবো দশ-পনেরো জন সেখানে বসে চা খাচ্ছে আর আড্ডা দিচ্ছে। হেঁয়ালি করে অনেকেই বলছে, এসব বড়লোকের রোগ। আমাদের এ-রোগ ধরবে না। বেশি বুঝদার মস্তব পালোয়ান বলছে, ঐ দেখো, সালেহীন মাস্টার হাসপাতালের আটতলায় শুয়ে গ্লাসের মধ্যি দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে, নাকে নল ঢোকানো, হাতে স্যালাইনের তার প্যাঁচানো আছে।

–গ্রামে তো সাবধান থাকা অনেক সহজ। বাড়িতে খেয়ে মাঠের কাজে চলে গেলেই নিরাপদ। শুধু মানুষের সাথে মেলামেশায় দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। মাস্ক পরতে হবে, আর হাত সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে তারপর মুখে লাগাতে হবে। দরকার সচেতনতা।

–আমরা অনেক কথাই বলছি। মানুষ মানতে চাচ্ছে না।

–গ্রামের মানুষ একেবারেই সচেতন না, নির্বোধও বটে। শহরের একশ্রেণির মানুষও প্রায় তাই। নির্বোধ হওয়ার কারণে এদের বিপদ বেশি আসছে। মানুষ সচেতন হলে এ রোগ অনেকটাই এড়ানো যেত। অনেকের দায়িত্ববোধও নেই বললেই চলে। অসুস্থতা ঢেকে রাখছে। অন্যকে আক্রান্ত করছে। কেউ কেউ অজানাবশত অন্যকে আক্রান্ত করছে। কারণ সে জানেই না যে, সে আক্রান্ত। পরীক্ষাও নেই। রোগের শুরুতে সর্দিজ্বর ভেবে বসে থাকছে। পরিবারের সবাই ক্রমশ আক্রান্ত হচ্ছে। এক বাড়ির রোগ অন্য বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে। কারো শ্বাসকষ্ট বেশি দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে রোগীর অবস্থাও খারাপ, আবার আক্রান্তের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে। এ এক নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। অজ্ঞতা ও অসচেতনতা এক ধরনের পাপ। এই পাপে যে কত অগুনতি নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে যাবে, তার হিসেব কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। তোমরা ঈদে এবার কী করছো?

–আমরা ঈদের কোনো প্রস্তুতি নিচ্ছিনে। জীবন বাঁচানো দরকার। বেঁচে থাকলে জীবনে সবই হবে, অনেক ঈদ আবার আসবে। ঈদের দিন নামাজে যাবো ভাবছি। দূরত্ব বজায় রেখে নামাজটা পড়ে চলে আসতে চাচ্ছি। সারা বছরের অন্য দিনে মাংস খাওয়া, আর ঈদের দিন মাংস খাওয়ার পার্থক্য আমি বেশি একটা বুঝিনে।

সালেহীন মাস্টারের মনটা খুব খারাপ যাচ্ছে। এ দেশের মানুষের হুজুগে-মাতা স্বভাব ও বোধহীনতার কথা ভেবে মনটা খুব ক্ষুব্ধ হচ্ছে। রাতে খাবারের টেবিলে বসে ছেলে-মেয়েদের সাথে এ দেশের মানুষের শিক্ষাহীনতা ও কুশিক্ষা নিয়ে অনেক অসন্তুষ্টির কথা বললেন। তিনি বললেন, সামাজিক এই শিক্ষার সাথে লেখাপড়া জানা না-জানার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা এক ধরনের মানসিক বিকলতা। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া নোট বই মুখস্থের শিক্ষা দিয়ে এ পর্যায় থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। চাই সুশিক্ষিত সচেতন জনগোষ্ঠী।

পরদিন সকালে গ্রামের পাশের পুলিশ ক্যাম্পের দারোগা ফোন করলেন।

–স্যার, কেমন আছেন? এবার ঈদে বাড়ি আসছেন না-কি?

–না, সম্ভব হচ্ছে না। না-আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে পরিস্থিতি ভালো না। গ্রাম

এলাকার পরিস্থিতিও খারাপ শুনছি। পরিস্থিতি ভালো হলে পরে আপনাদের সাথে দেখা হবে। এলাকার মানুষকে যতটা পারা যায় নিয়মমতো চলতে বলুন। স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা বেশি বেশি বলুন। নিজেরাও সাবধানে থাকুন।

—স্যার, আমরাও অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু এলাকার মানুষের সাথে পেরে উঠছিনে। তিন দিন আগে লকডাউন উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। লকডাউনের সময়ও দেখেছি, মানুষ কোনো বাছবিচার করছে না। কোনোভাবে মাস্কটাও পরানো যাচ্ছে না। আমাদের দেখলে কেউ কেউ মাস্কটা পকেট থেকে বের করে পরছে। আমাদের দেখে দল বেঁধে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমরা চলে এলেই আবার খুলে রাখছে। স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই মানছে না। কয়েক দিনের জন্য তো লকডাউন উঠিয়ে নিয়েছে। মানুষের বাঁধভাঙা জোয়ার চলছে। ঈদের বাজারে যেন মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নির্ঘাত মৃত্যুকে দেখে ভয় পাচ্ছে না, আমাদের দেখে ভয় পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিষয়টাকে নিজেদের কিছু না, সরকারের মাথাব্যথা হিসেবে ভাবছে। মরছে, কবরে যাচ্ছে, পরীক্ষাটাও ঠিকমতো হচ্ছে না। অধিকাংশ মৃত্যুই রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে না। এখনই রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে গেলে দেখবো, দশ-বারো জন লোক বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমার যাওয়া দেখলেই সব পালাবে। এভাবে কতক্ষণ আর পাহারা দিয়ে পারা যায়। আমাদেরও তো সীমাবদ্ধতা আছে!

—আমাদের এলাকা শিক্ষায় খুব অনগ্রসর, অনুন্নত এলাকা। রোগের ধরন সম্পর্কেই অনেকে এখনো ভালো করে জানে না। রোগের ভয়ঙ্কর রূপ, তীব্রতা ও বিভীষিকাময় ধ্বংসলীলা ওদের কল্পনাতেই আসে না, বুঝতেও চায় না। দেশ-বিদেশের খবরাখবর পড়ে না, শোনে না। টিভিতে শুধু নাটক ও সিনেমা দেখে জীবন পার করে। অন্যান্য প্রায় সব কাজে আল্লাহর দেওয়া বিধিনিষেধ মানে না সত্য, মুসলমানের বৈশিষ্ট্যও নেই বললেই চলে। কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আল্লাহর উপর পুরোটাই ছেড়ে দিচ্ছে। অন্তত এ কাজে খুব আল্লাহ-ভক্ত ভাব দেখাচ্ছে। এটা এক ধরনের বোধহীনতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা। আপনাদের দায়িত্ব যতটা সম্ভব পালন করে যান। নিজেদের সাবধানতাও বজায় রাখুন।

গ্রামের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে চারজনের অবস্থা বেশ খারাপ। দুজনকে ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করলেন। কোথাও সিট খালি নেই। হাসপাতালের পর হাসপাতাল

খুঁজে চলেছেন। একটু মানসম্মত হাসপাতালে ভর্তি করাতে গেলে গলাকাটা খরচ। রোগীর পরিবারের পক্ষে এত খরচ বহন করা সম্ভব নয়। আবার কিছু কিছু নির্ধারিত হাসপাতাল আছে ডাম্পিং স্পট। জেলা হাসপাতালেও এত খারাপ রোগী রাখা সম্ভব হয়নি; অপ্রতুল সরঞ্জাম, অব্যবস্থা, নির্বিকার ও সীমিত জনবল। সালেহীন মাস্টার আক্রান্ত আত্মীয়-স্বজন নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। অনেক আক্রান্ত রোগী রোগ চেপে যাচ্ছে। ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে সামাজিক মর্যাদাহানির গন্ধ খুঁজছে।

দুপুরের পর ঢাকায় বাস করা ছোট বোন ফোন করলো। খবর ভালো না। গ্রামের বাড়িতে তার দেবরের সংসারে সবাই আক্রান্ত। দু সপ্তাহ আগে গ্রামে থাকা দেবরের শ্বশুরের হার্ট-অ্যাটাক করেছিল। উপজেলা শহরের হাসপাতালে এক সপ্তাহ ভর্তি হয়েছিল। এলাকার যত আত্মীয় সবাই ঘটা করে রথের মেলা দেখতে যাবার মতো দল বেঁধে খাবার-দাবার হাতে করে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিল। অনেক নিষেধ করেও কাউকে আটকে রাখা যায়নি। হাসপাতালে বসেই সবাই বাড়ির রান্না করা খাবার মজা করে খেয়েছে। শয্যাগত আত্মীয়র পাশে থেকেছে। রোগীর সেবা-যত্ন করেছে। সুখ-দুঃখের কথা বলেছে। দেবরের শ্বশুরবাড়ির সবাই আক্রান্ত। জ্বর, সর্দিকাশি, মাথাব্যথা। দেবরের একটামাত্র ছেলে। ছেলেটার গত রাত থেকে ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। উপজেলা হাসপাতাল থেকে বলেছে, পুরোনো জেলা হাসপাতালে তাড়াতাড়ি ভর্তি করাতে। তাকে নিয়ে কে দৌড়াবে! নিকটতম সবাই বিছানাগত। তার ননদের মেয়ের পরিবারের সবাইও আক্রান্ত। জামাইটার মর মর অবস্থা। জেলা হাসপাতালে বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব হচ্ছে না। আইসিইউতে রাখা দরকার। বার বার ফোন দিচ্ছে, ঢাকাতে কোথাও ভর্তির ব্যবস্থা করা যায় কি-না। দেবরের ছেলেটার করোনার সব রকম উপসর্গ পাওয়া যাচ্ছে। আবার করোনার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সেই রিপোর্টটাই বার বার করে দেখাচ্ছে ও বলছে, তার করোনা হয়নি। যে কোনো কারণে ফল্‌স নেগেটিভ রিপোর্ট যে আসতে পারে, কথাটা আমলে নিতে চাচ্ছে না। ছেলেটার প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছে। বার বার ফোন করে খবর নিচ্ছি। অথচ কিছুই করতে পারছিনে।

–দেখো, নিজেকে নিরাপদ রেখে যতটুকু সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়, করো। সব সচেতন মানুষের মনে ‘আমার কী হবে! আমার কী হবে!’ মনোভাব চলে এসেছে।

দয়ামায়াও যেন অনেকটাই উঠে যাচ্ছে। দয়ামায়া উঠে না গিয়ে উপায়ও নেই। একটা শ্রেণি এর মধ্যেও নির্বোধের মতো কাজ করছে। কোনো বুঝ নিতে চাচ্ছে না। পরিস্থিতিকে আরো খারাপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একটু সাবধানতার মধ্যে থাকো। আমি পরে খোঁজ নেবো। –এ কথা বলে সালেহীন মাস্টার ফোনটা রাখলেন।

রাতে ভারতে এক বন্ধুকে ফোন করলেন। সেখানকার খবর নিচ্ছেন।

সালেহীন মাস্টার বন্ধুকে বললেন– তোদের কী খবর? কেমন আছিস সবাই? বৌদি কেমন আছেন? তুই তো ডাক্তার মানুষ। তোর অনেক তথ্য জানা।

–আমরা এখনো অক্ষত আছি। বাইরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া একটুও বেরোইনে। প্রথম ঢেউয়ে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। দ্বিতীয় ঢেউয়ে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। অনেক ক্ষেত্রেই মৃতদেহ দাহ ও সৎকার করা সম্ভব হয়নি। মৃত্যুহার এখন একটু কমে আসছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর হবার কারণ ছিল করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট, ধর্মীয় উন্মাদনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতা। আক্রান্তের সংখ্যা যত বাড়তে লাগলো, হাজার হাজার মেয়েদের মাথায় জলের কলস নিয়ে সারি বেঁধে মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সামনে জলভর্তি কলস রেখে আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে ফেরা তত বেড়ে গেলো। কখনো কখনো করোনা থেকে বাঁচার জন্য স্বাস্থ্যবিধি না মেনে বিভিন্ন মন্দিরে পূজারির ঢল বয়ে গেলো। পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে থাকলো। মানুষ তত আক্রান্ত হয়ে মরে ভেসে গেল। এ এক সীমাহীন কুসংস্কার। সরকার এসব বুঝতে পেরে ত্বরিত নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো। তবু এত বছরের ধর্মীয় কুসংস্কার কি এত সহজে যায়! অল্প সময়ের মধ্যে আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সবারই করোনা ভ্যাকসিনের সুব্যবস্থা করলো। তারপর কিছুটা রক্ষে। এখানে এখনো বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার রয়ে গেছে। তার ফল তারাই ভোগ করছে। দেশটা এতে দারুণভাবে ভুগছে। সরকারিভাবে স্বীকার করছে না। গবেষকরা হিসাব কষে দেখাচ্ছেন, মৃত্যুর সংখ্যা চল্লিশ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। এ এক বীভৎস অবস্থা, ভাষায় বর্ণনা সম্ভব না। অনেক মৃতদেহের সৎকারের লোক পাওয়া যায়নি। কেউ কারো খোঁজও নেয়নি।

–আমাদের অবস্থাও বেশ খারাপ। ঐ রকম ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা ভেবে গা শিউরে

উঠছে। এ দেশে তো স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা খুব খারাপ। আবার সাধারণ মানুষ যতটা না কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তারচে বেশি অসচেতন, অজ্ঞ ও নির্বোধ। নিজের সাধারণ বিচারবুদ্ধিও কাজে লাগাতে নারাজ। অথচ ভোগান্তিটা সবার উপর বর্তায়। স্বাস্থ্যবিভাগ আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সবাইকে সহজে টিকা দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। একটু সময় নেবে। অনেকে আবার টিকা নিতে চাচ্ছে না। এছাড়া আরেকটা কাজ করতে পারতো। স্বাস্থ্যবিভাগ থানাওয়ারি ছোট ছোট টিম করে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে পারতো। জরুরি কয়েকটা টেলিফোন নম্বর দিতে পারতো। যে বাড়িতেই রোগী দেখা দিত, সেখানে লোক-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। ছোঁয়া এড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারতো। বাড়িতে রেখেই যথাসম্ভব পরীক্ষা ও চিকিৎসা দিতে পারতো। সবার তো আর অক্সিজেনের দরকার পড়ে না। বিশেষ প্রয়োজনে সরকারি অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিতে পারতো। এমন কমিটেড স্বাস্থ্য-জনবল আমাদের দেশে নেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যবিভাগ নিজেও অন্য অনেক বিভাগের মতো কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত। অর্থাৎ এ অবস্থার উন্নয়ন সহজে হবে বলে মনে হয় না। সচেতনতা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে এক জায়গার রোগ সাত জায়গায় ছড়াচ্ছে। আবার সমস্ত টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য বিশেষভাবে বেশি করে প্রচার চালাতে পারতো। তাও নামমাত্র হচ্ছে।

–তোরা তো শিক্ষক মানুষ। স্বাস্থ্যবিভাগকে সদুপদেশ দিতে পারিস। দেশবাসী এতে উপকার পায়।

–সদুপদেশ নেওয়ার লোক কম। আর আমি তো ক্ষুদ্র মাস্টার সাহেব! আমার পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দলের তোষামোদি করা সম্ভব না। তাছাড়া নিরপেক্ষভাবে সত্য পরামর্শ দিতে গিয়ে কলম একটু বাঁকা হলেই নিরুদ্দেশ থেরাপির ভয় আছে। এই বুড়ো বয়সে অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করে পা ফেলতে হয়। তবু মনটা অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠছে। আমি ফোনে ফোনে গ্রামের অনেক মৃত্যুর খবর পাচ্ছি। সেসব খবর তো আর পেপারে ও টিভিতে আসছে না। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণ রোগ ভেবে পরীক্ষাও করাচ্ছে না, কিন্তু মরছে। কেউ কেউ হাসপাতালের দুরবস্থা দেখে ওদিকে সহজে ভিড়তে চাচ্ছে না। আমারই এক রোগী হাসপাতালে নেওয়ার পর দুদিন বাদে পরীক্ষা করিয়েছিল। পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসাতে চিকিৎসা

না দিয়ে ফেলে রেখেছিল। বাধ্য হয়ে ঢাকায় এক প্রাইভেট হাসপাতালে এনে ভর্তি করিয়েছি। এর মধ্যে তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফুসফুস বেশি পরিমাণে আক্রান্ত। শ্বাসকষ্ট খুব বেশি হচ্ছিল। আবার রোগীর সাথে থাকা লোকজনও বেশ বেআক্কল ধরনের। বার বার ঐ নেগেটিভ রিপোর্টটাই বড় করে দেখতে চায়। ভালো পরামর্শ নিতে চায় না। অশিক্ষার কারণে প্রকৃত অবস্থা বুঝতেও পারে না। নিজের দায়িত্বে কিছু করতে গেলে রিস্ক থাকে। শেষে দুর্নামের ভাগী হতে হয়। এর আগেও এমন বিপদে আমি অনেকবার পড়েছি।

–আমি তো তোর স্বভাবটা জানি। যতটা পারিস করতে থাক। তুইও তো করোনা থেকে উঠেছিস। নিজের প্রতি খেয়াল রাখিস। ভালো থাক। আমি মাঝে-মধ্যে খোঁজখবর নেবো।

–আমি তো করোনায় আক্রান্ত হলাম অফিস করতে গিয়ে। আর কিছু দায়িত্বহীন রোগচোর সহকর্মীর কারণে। এ রোগ সহজে এ দেশ থেকে চলে যাবে বলে মনে করিনে। টিকা নিয়ে, সুরক্ষা করে, স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলে কাজ-কর্ম করা ছাড়া কোনো বিকল্প তো আমি দেখিনে। বিশাল জনগোষ্ঠীর রুজি-রোজগারের কথা ও দেশের অর্থনীতির কথাটা ভাবতে গেলে মাথাটা পাক দিয়ে ওঠে। সরকারই-বা আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে কতদিন পারবে। সেখানে আবার সিস্টেম লসের বিষয়টা রয়ে গেছে। পরে আবার কথা হবে।

–শুভরাত্রি।

পরদিন সকাল দশ-এগারোটার সময় গ্রামের পাশে বাজারের এক দোকানি আত্মীয়কে সালেহীন মাস্টার ফোন দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন– তোমরা কেমন আছো? এলাকার অবস্থা কী?

–না মামা, এলাকার অবস্থা ভালো না। আমরা মোটামুটি আছি। লকডাউন কয়েক দিনের জন্য উঠিয়ে নিয়েছে। দোকান খুলেছি। মালামাল বেচার চেষ্টা করছি। অল্পবয়সী সেলসম্যানকে সামনে দিয়ে নিজে দূরে দূরে বসে টাকা গুনছি। দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। লোক গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। ঈদের বিক্রি চলছে। চুলের ফিতে, চুলের ক্লিপ, প্রসাধনী, চুড়ি-মালা, মেয়েদের হাতব্যাগ বেশি বিক্রি হচ্ছে।

–তোমার তো প্রসাধনসামগ্রীর ব্যবসা। বেচা-বিক্রি করতে থাকো। যারা এই ঈদকেই জীবনের শেষ ঈদ ভাবছে, তাদেরকে বেশি বেশি কিনতে দাও। মরলেও অন্তত প্রসাধনসামগ্রী ভালোমতো ব্যবহার করে মরুক।

–দোকানপাট তো মানুষে ভরা, কোনো বাছবিচার নেই, মানামানি নেই। অনেক ভিড়ের মধ্যে আছি। পরে কথা বলবো। এখন রাখি।

সালেহীন মাস্টার ফোনটা রেখে এলাকার মানুষের চিন্তাধারা ও সচেতনতা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। রাজধানীর দুই হাসপাতালে দুজন মুমূর্ষু রোগী আত্মীয় ভর্তি। তাদের সারাক্ষণ খোঁজখবর নিতে হচ্ছে। তাদের সাথে যে লোকগুলো সহযোগী হিসেবে এসেছে, তাদের রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা নেই, অজ্ঞতা বেশি, খুব-বেশি-বুঝি ভাব, বাস্তবতা বুঝতে নারাজ। তাদেরকে নিয়ে সুষ্ঠু চিন্তা করার অবকাশ কম। রোগীর জন্য সেবা দেওয়ার তুলনায় সহযোগীদের বোঝানোর কাজেই বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। এটাও জীবনের আরেক বাস্তবতা। মাস্টার মানুষ বলে হয়তো তা পারেন। তারপরও অশিক্ষিত লোক নিয়ে অনেক অসুবিধে। নেগেটিভ জিনিসগুলোকে নিয়ে বেশি বেশি ভাবে ও কথায় কথায় সামনে আনে। সুস্থ চিন্তা করতে জানে না। অপরিণামদর্শিতার কারণে যে ভোগান্তি বাড়ে, তা জানে না। কথা শুনতে চায় না, আবার বিপদে পড়ে শুধু কান্নাকাটি করে। অশিক্ষা ও অজ্ঞতা যে একটা পাপ এবং পাপে মৃত্যু, তা বোঝে না।

রাজধানীর গরুর হাটে গরু বিক্রি করতে এসেছে– গ্রামের এমন দুজন লোকের ফোন পেলো। তারা সালেহীন মাস্টারের বাসায় এসে থাকতে চায়, দেখা করতে চায়। এ আবার এক নতুন বিপদ। সালেহীন মাস্টারের সাধারণত থাকতে দিতে আপত্তি থাকে না; বরং আগ্রহসহকারে আসতে বলে। কিন্তু দেশের এ অবস্থায় কী করার আছে! হয়তো বাড়িতে ফিরে গিয়ে বলবে, সালেহীন মাস্টার বাসায় যেতে বলেনি, থাকতে বলেনি। 'মুখ দিয়ে একবার থাকতে বললেই কি আমি থাকতাম?' ইত্যাদি। উভয় সংকট। নির্বোধের শতেক দোষ। আত্মসচেতনতা নেই। দায়িত্ববোধ তো নেই-ই। তারা আবার 'রোগসংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে আলাদা রাখার ব্যবস্থা' (আইজোলেশন বা কোয়ারেন্টিন) শব্দগুলো জীবনেও শোনেনি

কিংবা স্বপ্নেও ভাবেনি। অথচ ডাক্তার সালেহীন মাস্টারকে বাসার বাইরে যেতে নিষেধ করেছেন। নতুন কাউকে চৌদ্দ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকা ছাড়া বাসায় আসতে দিতে নিষেধ করেছেন। সেজন্য নিজের বোনও অনেক মাস বাসায় আসে না। সালেহীন মাস্টারও বোনের বাসায় যান না। ফোনের মাধ্যমে সব যোগাযোগ। ভাগ্যিস, বিশ্বব্যাপী সেলুলার ফোনব্যবস্থা চালু হয়েছিল, নইলে জীবন স্তব্ধ হয়ে যেত। তবু জীবনযাত্রা যেন সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সামাজিকতা ও আতিথেয়তা নেই বললেই চলে। সব জায়গাতেই ভার্চুয়াল আন্তরিকতা।

ঈদে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধা দিচ্ছে। বিগত এক বছরের বেশি সময় ধরে হাজার হাজার পরিচিতজনের কাছ থেকে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যুর খবর তাঁর শুনতে হচ্ছে। জীবনের মন্দাকিনী স্রোতে এ কীসের আভাস! বিশ্বব্যাপী মানবজাতি হয়তো আজ বড় অস্থির, দুর্বিনীত, নির্বোধ ও মনুষ্যত্বহীন হয়ে গেছে, তাই। একজনের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্য না দেখা পর্যন্ত শুধু টুপি ও দাড়ি দেখে যেমন কাউকে মুসলমান বলে ভাবা যাচ্ছে না, ভোরে উঠে কোরান পাঠ করে শুনেও মুসলমান ভাবতে যেমন সন্দেহ হচ্ছে; তেমনি মানুষজাতি ক্রমশ মৌলিকতা ও যথার্থতাকে পিছে ফেলে লৌকিকতা ও কৃত্রিমতাসর্বস্ব হয়ে পড়ছে। ভোগবাদ ও বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসর্বস্ব স্বভাবের হয়ে পড়ছে। যেন বিশ্বটাই একটা স্ফিংস মূর্তির আদল। মানুষের মুখের কথার সাথে চিন্তা ও কাজের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবতে ইচ্ছে করে, মানবজাতি কেন আজ এ পর্যায়ে এসেছে। সৃষ্টির সেরা জীবের কেন আজ এ দশা, এ দুর্গতি? সাধারণ মানুষের বোধশক্তির পারদ কেন আজ এত নীচের পর্যায়ে চলে গেছে। তাহলে কি এ জাতির মহাবিপর্যয় সমাগত? মনোবিজ্ঞান কী বলে? কেন এমন হচ্ছে? এসব নিয়ে ভাবনার কোনো অবকাশ আছে কি? সালেহীন মাস্টারের মাথাভরা আজ এসব উদ্ভট চিন্তা।

এক আত্মীয় ফোন করেছে, 'অনেকেই তো ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি আসছে। তুমিও কি আসছো?'

সালেহীন মাস্টার নিরুত্তর। কিছুক্ষণ পর বললেন– আগামীকাল ঈদ। আজকের এক পত্রিকার ‘ঈদযাত্রায় সীমাহীন ভোগান্তি’ শিরোনামে লেখা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। ‘রাত পোহালেই কোরবানির ঈদ। তাই স্বজনদের সঙ্গে আনন্দের দিনটি উদযাপনের আকাঙ্ক্ষা ইট-পাথরের হৃদয়হীন শহরে আটকে থাকা মানুষগুলোর। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ঈদের পর টানা লকডাউনের আতঙ্ক। ফলে করোনার বাধাও এখানে তুচ্ছ। সব মিলিয়ে রাজধানী ঢাকা ছাড়ছে মানুষ। তবে ঝুঁকিপূর্ণ এই যাত্রায় ভোগান্তি সীমাহীন। যানবাহনের চরম সংকট, অসহ্য গরম, আবার হঠাৎ বৃষ্টি এবং তীব্র যানজট। এক্ষেত্রে ঢাকা থেকেই শুরু হয় যানজট। এছাড়া পথে পথে বাড়তি ভাড়া আদায়ের বিষয়টি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। কোথাও সামাজিক দূরত্ব নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছেন ছাদে কিংবা ইঞ্জিন কভারে। আবার টার্মিনালে পড়তে হচ্ছে নানা ঝামেলায়। কোথাও কোথাও হেঁটে পাড়ি দিচ্ছে দীর্ঘ পথ। তবে নানা বিড়ম্বনার মধ্যেও যেন আলাদা আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন যাত্রীরা। শেকড়ের টানে আপন ঠিকানায় বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ছুটছেন অবিরাম।’ আমার প্রশ্ন, এই ঈদে এত আনন্দ মানুষের আসছে কোত্থেকে? ঈদের দু দিন পর থেকেই আবার লকডাউন ঘোষণা করেছে। এই দু দিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে যাবার অবশ্যম্ভাবিতা ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, তা ভেবে দেখার বোধশক্তি ক’জনের আছে? কখনো ঈদের দোহাই দিয়ে, কখনো রাজনৈতিক প্রতিবাদের দোহাই দিয়ে, কখনো মহাদিন পালনের দোহাই দিয়ে জনগোষ্ঠীর নির্বোধ-অংশ পুরো জনগোষ্ঠীকে মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এদের দায়িত্বহীনতার কারণে সচেতন মানুষও পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জীবন হারাচ্ছে। এ দেশের নীতিনির্ধারকরা এ জনগোষ্ঠীর অসচেতনতা ও দায়িত্বহীনতা নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখবেন নিশ্চয়ই। আমি বাড়ি যাবার কথা ভাবছিনে; বরং চলো বলি– অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে মুক্তি চাই। মানবপ্রজাতি বলে পরিচয় দিতে গেলে সুশিক্ষা চাই। চলো প্রার্থনা করি– ‘দ্যুলোকে-ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া / তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি তোমারি করুণা কামী’।

(পল্লবী, ঢাকা: ২২.০৭.২০২১)

ড. আহমেদ ঊনচল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রকল্পে গবেষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তিনি আইসিএমএবি-র শিক্ষা ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি এএসিএসবি স্বীকৃত মালয়েশিয়ার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'ইউনিভার্সিটি উতারা মালয়েশিয়া'র ভিজিটিং স্কলার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। এছাড়া স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনোমিক্স-এর ডিন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সমাজসেবার সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট-এর একজন ফেলো। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ হিউম্যান রিসোর্স অর্গানাইজেশনস-এর ট্রাস্টি-বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আইসিএমএবি-এর অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইজরি কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট।

তিনি কেএসএম শিক্ষা-সেবা ট্রাস্টের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা-সেবা কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এতে তিনি সামষ্টিক উন্নয়ন মডেলের সাথে অনন্য ব্যষ্টিক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ করেন। সমন্বিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন; গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থ মানসিক বিকাশে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন; দুঃস্থদের জীবনমান উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

বিভিন্নমুখী শিক্ষার সন্নিবেশ ও অভিজ্ঞতা ড. আহমেদকে অনন্য করেছে। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (অনার্স) ও এমকম। বিআইএম থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আইসিএমএবি থেকে সিএমএ এবং বর্তমানে একজন এফসিএমএ। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচডি। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভর্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস '৮৫ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেন।

ড. আহমেদ গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'জীবনক্ষুধা', 'প্রতিদান চাইনি', 'কিছু কথা কিছু গান', 'অপেক্ষা', 'শেষবিকেলের পথরেখা', 'সত্যের গল্প গল্পের সত্য', 'সমকালীন জীবনাচার ও কর্ম', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা', 'এইসব দিনকাল' প্রভৃতি।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।